বৈশাখ ১৩৮৪

আনন্দমেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড : ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

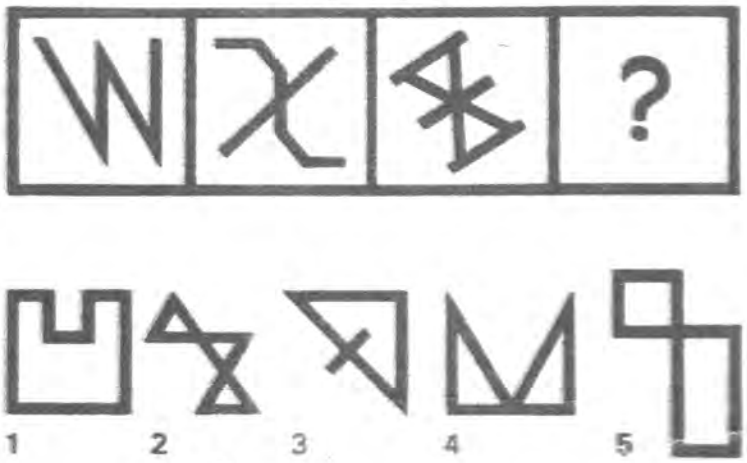

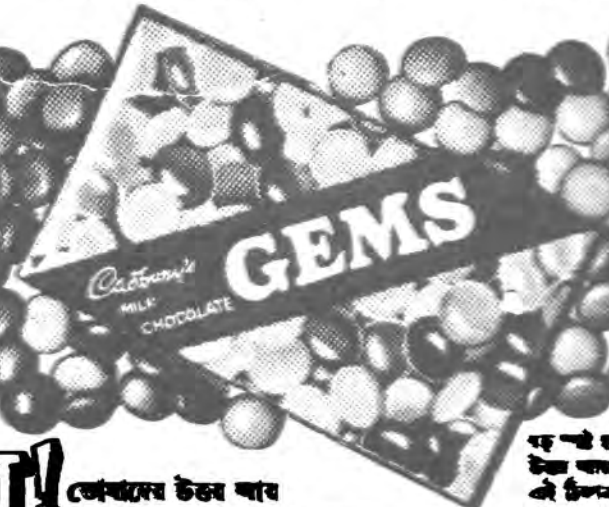

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!
এই পাঁচটি চিত্রের মধ্যে কোন্‌টি খালি জায়গায় মানানসই হবে?
?
1
2
3
4
5
Cadbury's
MILK CHOCOLATE
GEMS
শিগগির!
তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফট চেক পাবে।
রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস
CHAITRA-C-69 BEN

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৫১১ (১৬) টি-বি-সি; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭

ছড়া পিণ্ডারী না ঠগী। অন্নদাশঙ্কর রায় ৪
হাতিঘোড়া। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৫
রাত-পোকা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ১৯
ডু রু-এর ছড়া। সুতপা ভট্টাচার্য ৪০
তিনটি চড়ুই ও রুমেনি। সুব্রত চক্রবর্তী ২১
বাঁদরামি। জিতেন্দ্রিয় দাশগুপ্ত ১৬

গল্প চিত্তশুদ্ধি আশ্রম। বিমল কর ২২
রায়বাড়ির ঘড়ি। অজেয় রায় ১৭
চন্দ্রভানুর রাজ্যলাভ। রমানাথ রায় ৪৫
রাক্ষস। শৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪

বিশেষ রচনা সুরদেবের সঙ্গে। কানাইলাল সরকার ৫
টিন! টিনের গল্প। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১
বই-মেলায় ছোটদের বই। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
কলকাতার ডাইনোসর। অসিত পাল ৫২

উপন্যাস মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৭
সবুজ দ্বীপের রাজা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬

কমিকস টিনটিন ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫
বেড়ু-রহস্য ১৩, হাবলু ২০

লেখাপড়া টাকী গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান-শিক্ষক কী বলেন ৪১
কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৪২

খেলাধুলো মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল। চিরঞ্জীব ৪৭
রাজার খেলার মেয়েরা। পুষ্পেন সরকার ৪৯
পাঁচ টেস্টের অভিজ্ঞতা। সুব্রত সরকার ৫০
বংশী। চিত্ত বিশ্বাস ৫১

অন্যান্য লেখা ম্যাজিক ১৪. ডোডো-তাতাই ১৫
মাঠময়দানের খবর ১৬. তোমাদের পাতা ২১
ধাঁধা-মজা-রহস্য ২৮. ২৯
বানাও ৩২, আঁকো-শেখো ৩৩
মজার পড়া ৪৩, [illegible] ৫১

প্রচ্ছদ-চিত্র ও 'রায়বাড়ির ঘড়ি'র ছবি শ্রীঅলোক বসু এঁকেছেন।
'...ডারী না ঠগী' ও 'ডু রু-এর ছড়া'র ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী।
'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি' ও 'চিত্তশুদ্ধি আশ্রম'-এর ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র।
'হাতিঘোড়া'র ছবি এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।
'...কাতার বই-মেলায় ছোটদের বই'-এর ছবি তুলেছেন তপন দাশ।
'...রাজা তো' ও 'রাক্ষস'-এর ছবি এঁকেছেন অহিভূষণ মালিক।
'...বুজ দ্বীপের রাজা'র ছবি এঁকেছেন মদন সরকার।
'...ভানুর রাজ্যলাভ'-এর ছবি এঁকেছেন সুবীর রায়।

বৈশাখ ১৩৮৪
এপরিল ১৯৭৭

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
দেড় টাকা

সম্পাদক :
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল :
ত্রিপুরা ২৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

পিণ্ডারী না ঠগী

অন্নদাশঙ্কর রায়

খেলার মাঠে সন্ধ্যা নামে
থামে ছেলের দল
ভগী তাদের ক্যাপটেন, তার
বগলে ফুটবল।
বাড়ির পথে মার্চ করে—
"চল্ রে চল্ রে চল।"

চলতে চলতে শ্যাওড়াতলায়
শুনতে পেল হাবু
মনিষ্যি না ভূত কে যেন
বলছে, "ইয়ে বাবু!"
আঁধারে মুখ যায় না দেখা
হাবু ভয়ে কাবু।

দৌড়! দৌড়! হাবুর দৌড়!
তাকে থামায় যারা
"থামো! থামো!" বলেই ছোটে
হাবুর পিছে তারা।
"ইয়ে বাবু! শালাই হ্যায়?"
শুনছে তখন কারা।

বাড়ি ফিরেই তর্ক শুরু,
"মনিষ্যি না ভূত?"
সেটা কিন্তু বাতির আলোয়
শোনায় অদ্ভুত।
মনিষ্যি তা মানে সবাই
তবুও খুঁতখুঁত।

দাদা ছিলেন পুঁথিপোড়ো
বলেন, "ওরে ভগী,
প্রশ্ন হল আসলে সে
পিণ্ডারী না ঠগী?
ছেলে ধরার জন্যে কি তার
ছিল বাঁশের লগি?"

আমরা সেবার তরাসে যার
বীরের মতো পালাই,
রাত্তিরে সে বেচে বেড়ায়
কুলফিবরফ মালাই।
হাতের কুপি নিবে গেলে
চায় সে দিয়াশালাই।

গুরুদেবের ক্লাসে

কানাইলাল সরকার

আমাকে যখন কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ইশকুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়, তখন আমার বয়স খুব অল্প। মা-বাবাকে ছেড়ে দূরে থাকতে প্রথম-প্রথম খুব কষ্ট হত। কিছুদিন বাদেই কিন্তু অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে যাই। তখন আবার ছুটিতে কলকাতায় এসে দু-চার দিন বাদেই ভীষণ হাঁফিয়ে উঠতুম। কলকাতার জীবন তো একেবারে বন্ধ জীবন। মাঠ নেই, গাছপালা নেই, পার্ক গোটাকয় আছে বটে, কিন্তু তাতে বড্ড ভিড়, রাস্তার উপরেও লোক গিজগিজ করছে, হাঁটতে গেলে ধাক্কা লাগে। তাই কলকাতায় থাকতে একটুও ভাল লাগত না। খালি মনে হত, কবে আবার সেই খোলামেলা জায়গায় ফিরে যাব।

শান্তিনিকেতনে আমাদের ক্লাসও নেওয়া হত গাছতলায়। ইশকুলকে তাই ঠিক ইশকুল বলে মনে হত না। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তখন দ্বারিক-বাড়িতে থাকতেন। ক্লাসে বসেই কখনো-কখনো আমরা দেখতে পেতুম যে, গুরুদেব সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে শালবীথির ভিতর দিয়ে আনমনে হাঁটতে-হাঁটতে লাইব্রেরির দিকে চলেছেন। যেতে-যেতে তিনি থেমে দাঁড়াতেন, তারপর মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করতেন যে ক্লাসটা কিসের। যদি শুনতেন যে, বাংলা ইংরেজী কি ইতিহাসের, তাহলে অনেক সময় বলতেন, "আচ্ছা, তাহলে আজকের এই পড়াটা আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি।" আমার মনে আছে যে, ইতিহাসের ক্লাসে তিনি খুব সুন্দর করে একদিন প্রাচীন মিশরের সভ্যতার কথা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে এমন অনেক কথা সেদিন তিনি বলেছিলেন, আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যার উল্লেখ ছিল না। কবিতার ক্লাস হলে তো কথাই নেই, এমনভাবে তিনি কবিতাটি দু-তিনবার পড়ে শোনাতেন যে, তাইতেই যেন তার ভিতরকার অর্থ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যেত। একদিন পড়িয়েছিলেন নিজের লেখা 'পণরক্ষা' কবিতাটি। এমনভাবে পড়িয়েছিলেন যে, আমাদের মনে হয়েছিল, গোটা দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। দুর্গেশ দুমরাজের জন্য যে খুব কষ্ট পেয়েছিলুম, তাও মনে আছে।

আরও একটু বড় হবার পরে আমাদের সাহস অনেক বেড়ে গেল। তখন অনেকদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েও হানা দিয়েছি। না, পড়া বুঝে নেবার জন্য নয়, ডাকটিকিটের লোভে। কিন্তু ডাকটিকিটের গল্প বরং আর একদিন বলব, আজ শুধু পড়া বুঝে নেওয়ার গল্পটাই বলি। মজা এই যে, পড়া বুঝে নেওয়ার জন্যেও আমরা একদিন গুরুদেবের বাড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছিলুম।

১৯২৫ সালের কথা। তখন আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি। পরের বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব, তাই পড়াশুনোর খুব চাপ চলছিল। তার উপরে আবার আমরা কয়েকজন ইংরেজীতে একটু পিছিয়ে পড়েছিলুম। সেইজন্যে আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে অন্যদের মতো শান্তিনিকেতন ছেড়ে বাড়ি যেতে পারিনি। আমাদের বলা হয়েছিল, "বাড়ি গেলে তো আমোদ-আহ্লাদ করে ছুটি কাটাবে, পড়াশুনো ঠিকমতো হবে না। তার চেয়ে বরং বোর্ডিংয়েই থেকে যাও, মাষ্টারমশাইরা তোমাদের সাহায্য

ছবি রবীন্দ্রনাথ সিংহ

করবেন, তোমরাও তার ফলে ইংরেজীর গলদটা চটপট ঝালাই করে নিতে পারবে।"

বোর্ডিং দেখতে-দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল। রয়ে গেলুম শুধু আমরা দু-চারজন পরীক্ষার্থী। আর রইল সেইসব বন্ধু, যারা শান্তিনিকেতনেরই বাসিন্দা। সারাদিন যে যার ঘরে নিজে-নিজে পড়তুম। তারপর সন্ধ্যার দিকে দল বেঁধে যেতুম আমাদের ইংরেজীর শিক্ষক শ্রীপ্রমদারঞ্জন ঘোষ মশাইয়ের বাড়িতে। যাতে আমাদের ইংরেজীর গলদটা মেরামত হয়ে যায়, তার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। লণ্ঠনের চারপাশে গোল হয়ে আমরা বসতুম। ঘন্টার-পর-ঘন্টা তিনি পড়িয়ে যেতেন। ঘুম আমাদের চোখের পাতা জড়িয়ে আসত ; অনেক সময় তিনি নিজেও ঢুলতে থাকতেন। কিন্তু সে-কথা বললেই তিনি রেগে যেতেন খুব। বলতেন, "আমার কষ্টের কথা তোদের ভাবতে হবে না, নিজেরা ঠিকমতো লেখাপড়া শিখে মানুষ হ দেখি।"

কিন্তু, মানুষ হতে গিয়ে আমাদের তো প্রাণান্ত হবার উপক্রম। গ্রামার, ট্রানস্লেশন, সামারি, সাব্‌সট্যান্স, প্রিসি রাইটিং—পড়ছি তো পড়ছিই, লিখছি তো লিখছিই। তার উপর আবার ইংরেজী কবিতা তখনও বাকী রয়েছে।

ঠিক সেই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। বন্ধুদের বলি, "দ্যাখো, এখানে আর কবিতা পড়ে কাজ নেই।"

অবাক হয়ে তারা বলল, "তাহলে কোথায় পড়ব?"

আমি বললুম, "গুরুদেবের কাছে। ক্লাসে তো মাঝে মাঝে তিনি আমাদের কবিতা পড়িয়েছেন। এবারে চলো, পরীক্ষার পড়াটাও তাঁর কাছেই বুঝে নেব।"

যে কথা, সেই কাজ। গুটিগুটি আমরা একদিন সকাল-বেলায় গুরুদেবের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। আমরা মানে আমি, লাবু (অর্থাৎ স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন মশাইয়ের মেজো মেয়ে শ্রীমতী মমতা), অমিতা (অর্থাৎ বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক স্বর্গত অজিত চক্রবর্তী মশাইয়ের মেয়ে), তাপসী দাশ (ইনি ঢাকা থেকে এসেছিলেন), এবং আরও কয়েকজন।

গুরুদেব আমাকে কানাই বলতেন না। তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন শ্যামের বাঁশি। আমাদের দেখে বললেন, "কী খবর শ্যামের বাঁশি? হঠাৎ দলবল নিয়ে এই সকালবেলায় এসে হানা দিয়েছ যে? ডাকটিকিট চাই বুঝি?"

আমি বললুম, "না। আমরা পড়তে এসেছি। পরীক্ষার আর দেরি নেই। ইংরেজী কবিতাটা আপনি আমাদের একটু বুঝিয়ে দিন।"

শুনে গুরুদেব বললেন, "ও। তা আমার বুঝি অন্য কোনও কাজ নেই?"

আমরা বললুম, "যতই কাজ থাক, আমাদের পড়াতেই হবে।"

আমাদের জেদ দেখে গুরুদেব হেসে ফেললেন। বললেন, "কী বই পড়িস তোরা?"

তখন আমাদের পরীক্ষা নিতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের প্রকাশিত বই-ই আমাদের পড়তে হত। ইংরেজী কবিতার সেই বইখানা আমরা গুরুদেবের হাতে তুলে দিলুম। তিনি সেখানা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে বললেন, "এতে চলবে না। আমি বরং প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে কিছু কবিতা তোদের পড়িয়ে দিই। তাতে তোদের ভিতটা তৈরি হয়ে যাবে। তখন তোরা এই পাঠ্যপুস্তকের কবিতাগুলি নিজেরাই বুঝে নিতে পারবি।"

বাস, শুরু হয়ে গেল আমাদের কবিতার ক্লাস। দিন কয়েক বাদে আমাদের বন্ধু শান্তিদেবও (শান্তিদেব ঘোষের নাম তো তোমরা সকলেই শুনেছ) সেই ক্লাসে এসে যোগ দিল। ক্রমে-ক্রমে রটে গেল যে, গুরুদেব খুব সুন্দর করে ইংরেজী কবিতা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তখন মাষ্টারমশাইরাও আসতে শুরু করলেন। কলকাতা থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশাই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনিও তখন নিয়মিতভাবে সেই ক্লাসে এসে হাজিরা দিয়েছেন।

গুরুদেব যে কী সুন্দর করে কবিতা পড়াতেন, তা বুঝিয়ে বলতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। যে কবিতাটি পড়াচ্ছেন, প্রথমে তিনি বারকয়েক সেটি পড়ে শোনাতেন। তারপর কঠিন-কঠিন শব্দগুলির মানে বলে দিতেন। তারপর, খুব সংক্ষেপে, বুঝিয়ে দিতেন তার তাৎপর্য। শেষে বলতেন, "যা বুঝেছিস, তোরা নিজেদের ভাষায় সেটাকে লিখে আমাকে দেখা।"

কলকাতায় ফিরে এসে প্রবাসী পত্রিকায় এই ক্লাস সম্পর্কে রামানন্দবাবু একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখেছিলেন। কিন্তু সে-কথা থাক। আজ বরং বলি যে, গুরুদেবের সেই ক্লাস সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে কী উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। ছাত্রীদের সঙ্গে অনেক সময় তাদের মায়েরাও আসতেন। আমার সঙ্গে যেতেন দিনদা, অর্থাৎ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুদেব যখন আমাকে কোন প্রশ্ন করতেন, তখন উত্তর জানা সত্ত্বেও অনেক সময় আমি কুণ্ঠা কাটিয়ে কিছু বলতে পারতুম না। পিছন থেকে দিনদা তখন আমাকে উৎসাহ জোগাতেন। দিনদা বলতেন, "অন্যদের অভিভাবকরাও তো উৎসাহ জোগান। তোকে কে উৎসাহ জোগাবে? আমি সেইজন্য আসি।"

তবু একদিন বিপদে পড়তেই হল। বিকেলবেলায় আমরা জনাকয় ছাত্র যখন ক্লাসে যাচ্ছি, তখন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, "কাল এখানে মহাত্মা গান্ধী আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ফুল চাই। তোমরা কজনে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। শান্তিনিকেতনের ধারেকাছে যত পুকুর পাবে, তার থেকে পদ্মফুল তুলে আনবে। আমরা ঠিক করেছি, মহাত্মাজীর থাকবার ঘরটা শুধু পদ্মফুল দিয়ে সাজিয়ে দেব।"

ক্লাস করা আর হল না। সাইকেল নিয়ে আমরা পদ্মফুলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি গুরুদেবের মুখে হাসি নেই। তার উপর আবার ভৃত্যকে ডেকে এমনভাবে তাঁর ইজিচেয়ারটাকে তিনি ঘুরিয়ে নিলেন, যাতে ছেলেদের মুখ তাঁকে আর না-দেখতে হয়। আমরা তো বিপদ গনলুম। ব্যাপার কী? আমরা কি কোনও দোষ করেছি?

গম্ভীর গলায় গুরুদেব বললেন, "ঠিক করেছি, এখন থেকে শুধু মেয়েদেরই আমি পড়াব। ছেলেদের আর পড়াব না।"

রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করলুম, "কেন?"

গুরুদেব বললেন, "কাল তোমরা ক্লাসে আসোনি কেন?"

আমি বললুম, "রথীদা আমাদের পদ্মফুল জোগাড় করতে পাঠিয়েছিলেন।"

"সে-কথা আমাকে জানিয়ে যাওনি কেন?"

এর আর কী জবাব দেব? বুঝতে পারছিলুম, অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না?

ক্লাসের শেষে লাবু আর অমিতা বলল, "গুরুদেব তো খুব ফুল ভালবাসেন। তোমরা কালকে ক্লাসে আসবার সময় ফুল নিয়ে এসো। তাহলে নিশ্চয় রাগ পড়ে যাবে।"

শান্তিনিকেতনের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সেবারে আমরা বেল-ফুল জোগাড় করি। মেয়েরা রাত জেগে সেই ফুল দিয়ে সাড়ে ছ ফুট লম্বা একটা মালা বানিয়ে দেয়। পরদিন একটা থালার উপরে সেই মালা সাজিয়ে আমরা ক্লাসে যাই।

বাস্, গুরুদেবের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। আবার শুরু হয়ে গেল কবিতার ক্লাস।

মনোজদের অদ্ভুত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে

মনোজদের বাড়িতে একটি অচেনা ছেলের ছবি আছে। ছবির ছেলেটাকে মনোজের খুব ভাল লাগে। ওদের বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাঁচিল টপকে ওদের বাড়িতে ঢোকার সময় কাকের ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়লেন উঠোনে। তাঁর ছিটকে-পড়া পিস্তল লুকিয়ে পাচার হয়ে গেল পুতুলের পুতুল-খেলার বাক্সে। হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণের নিখোঁজ ছেলে কন্দর্পনারায়ণের ছবির সন্ধানে এসে হতাশ হলেন বরদাচরণ। রাজামশাই বলেছেন, যার কাছে রাজকুমারের ছবি পাওয়া যাবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই না শুনে মনোজের বাবা রাখোবাবু বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা খুঁজে বার করতেই হবে। পুতুলের বাক্স থেকে পিস্তলটা মনোজের কাকা ভজবাবুর হাতে এল। ভজবাবুর হাতে পিস্তল দেখে গোয়ালা হরশঙ্কর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভজবাবু পিস্তলের শক্তি-পরীক্ষা করতে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। ওদিকে গোবিন্দনারায়ণ যখন মন ভাল করার জন্যে গুপ্ত কুঠুরিতে বসে টাকা গুনছেন, তখন হঠাৎ সেখানে বরদাচরণ হাজির হয়ে বললেন, টাকাগুলো সব অচল। বলেই পালিয়ে গেলেন। এদিকে, মনোজদের বাড়িতে সবাই কুমার কন্দর্পনারায়ণের ছবি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। ছবিটা কিন্তু মনোজের বইয়ের মধ্যে। ভজবাবু পিস্তল হাতে অপমানের শোধ তুলতে গিয়ে হেড স্যার গোলোকবিহারী চক্রবর্তীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে ফেরে গেলেন। তারপর একজন পুলিশ কনস্টেবল, তাস-খেলুড়ে, সুদখোর গোবিন্দ আর বেহিসেবী শার্দুলকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে ডাকাতের একটা দলের ওপর পিস্তল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডাকাতের দলে কানাই মাছওলা ছিল। কানাইকে ওঠবোস করাতে যাবার সময় তিনি ধরা পড়ে গেলেন মেজো সর্দারের হাতে। সর্দার বলল, একে আজ মা কালীর সামনে বলি দেওয়া হবে। অতঃপর—

১১

বেশ রাত হয়েছে।

মনোজদের বাড়ির অবস্থা বেশ থমথমে। হারানো ছবিটা পাওয়া-যায়নি বলে রাখোবাবু প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সন্ধেবেলার পর যেসব খবর এসেছে তাতে তাঁর রাগ জল হয়ে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে গেছে।

প্রথমেই থানা থেকে একদল সেপাই নিয়ে দারোগা নিশিকান্ত এসে হাজির। নিশিকান্ত ভারী কড়া দারোগা, একবার তাঁর দুই ছেলে মারপিট করে একজন অন্যজনের মাথা ফাটিয়েছিল বলে তাদের দুদিন করে হাজতবাস করিয়েছিলেন। আর একবার তাঁর স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি যাওয়ায় স্ত্রীর নামে ওয়ারেণ্ট বের করেন। শুধু অন্যের বেলাতেই নয়, নিজের বেলাতেও তিনি সমান কড়া। যদি চোর ডাকাত ধরতে না পারেন, কোনো অপরাধের যদি কিনারা না হয় তবে তিনি নিজে নাকে খত দেন, উপোস করেন, কখনো বা সেপাইকে ডেকে বলেন—আমাকে দশ ঘা বেত মার তো! ভারী কালীভক্ত লোক। যদি কেউ নিশি দারোগাকে কালীর গান শোনায় তবে তাঁর ভর হয়। চিৎপাত হয়ে পড়ে গোঁ-গোঁ করে মুখে গ্যাঁজলা তোলেন।

নিশি দারোগাকে সবাই তাই সমঝে চলে।

সন্ধেবেলা এসেই তিনি বাইরে থেকে হাঁক ছাড়লেন, "ভজবাবু, আমরা বাড়ি ঘিরে ফেলেছি, পালাবার চেষ্টা করবেন না বা গুলি ছুঁড়বেন না। যদি গুলি ছোঁড়েন তবে আমরাও ছুঁড়ব। যদি পালান তো আমরাও পালাব— খুড়ি আমরা আপনাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলব। কোন চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।"

এমনিতে নিশিকান্ত যতই কড়া হোন না কেন, লোকে বলে তিনি ভারী ভিতু লোক। ঘুষ নেন না বটে তবে ঘুষিও চালান না। গুলিটুলি চালাতেও তাঁর অনিচ্ছে ভীষণ। চোর-ডাকাতদের পিছু নেওয়া বা বিপজ্জনক লোককে গিয়ে ধরা-টরার কাজেও তিনি নেই।

তবু তাঁর হাঁক-ডাক শুনে বাড়ির লোক সব হন্তদন্ত হয়ে বেরোল।

দুঃখবাবু মনোজ, সরোজ আর পুতুলকে পড়াচ্ছিলেন। গণেশবাবু একমনে একটা তান ধরেছেন। পুলিশের বুটের আওয়াজ আর গলার দাপট শুনে দুঃখবাবু তাড়াতাড়ি উঠে সরোজ, মনোজ আর পুতুলকে বললেন, "চলো ভিতরবাড়িতে যাই। এখানটায় গরম হচ্ছে।"

গণেশবাবুরও সুরটা কেটে গেল। বাড়িতে পুলিশ এসেছে টের পেয়ে তিনি তানপুরাটা বগলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে, পালিয়ে যান। কিন্তু বেরোতেই বাগানের ফটক থেকে একেবারে মুখের ওপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ল। সেই আলোতে একটা রাইফেলের নল বা পুলিশের লাঠি যাহোক একটা বস্তুও দেখা গেল। নিশি দারোগা হুংকার ছাড়লেন, "বন্দুক ফেলে দিয়ে হাত তুলুন।"

গণেশবাবু চিঁচিঁ করে বললেন, "বন্দুক নয়, তানপুরা।"

"তানপুরাই ফেলুন।"

এ সময়ে রাখোবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "এসব কী। কী হয়েছে নিশিবাবু?"

নিশিকান্ত অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বললেন, "আপনার ভাই ভজহরিবাবুর নামে ওয়ারেণ্ট আছে।"

"ওয়ারেণ্ট মানে? কিসের ওয়ারেণ্ট?"

এই শীতেও নিশিকান্ত কপালের ঘাম মুছে বললেন, "একজন মার্ডারারকে ঘরে লুকিয়ে রেখে আর ভান করবেন না রাখোবাবু। দয়া করে ওঁর পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে হাত দুটো ভাল করে বেঁধে আমাদের কাছে এনে দিন।"

"কার পিস্তল? কে মার্ডারার? কাকে বাঁধব?"

নিশিকান্ত খুব বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, "সবই তো জানেন রাখোবাবু, কেন অভিনয় করছেন? ভজবাবু যে এত বড় মার্ডারার তা যদি আগে জানতাম! ভদ্রবেশে এত বড় খুনী এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেউ টেরই পায়নি। কত দারোগাই তো এ শহরে এর আগে এসেছে, কেউ ধরতেও পারেনি। কিন্তু এবার ভজবাবুর খেলা শেষ। আমার হাতেই আজ এত বড় রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে। কৈ, নিয়ে আসুন তাকে। সাবধান,

যখন আনবেন তখন যেন পিস্তলটা হাতে না থাকে।"

রাখোবাবু আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "ভজু মার্ডারার?"

পিছন থেকে আদ্যাসুন্দরী বলে উঠলেন, "এ দারোগাটাকে পেন্নীতে পেয়েছে।"

ঠাকুমা কেঁদে উঠে বললেন, "বন্দুক পিস্তল দূরে থাক বাবা, আমার ভজু দা দিয়ে বাঁশ পর্যন্ত কাটে না, পাছে বাঁশ ব্যথা পায়।"

কিরমিরিয়া দারোগা পুলিশ দেখে বিলাপ করে কাঁদছিল, "ওগো, আমাকে ধরে নিয়ে যেও না গো। আমি কালই মুলুকে চলে যাব গো। ভজবাবু কেন পিস্তল দিয়ে খুন করল গো!"

"চুপ কর তো কিরমিরিয়া!" বলে রাখোবাবু ধমক দিলেন।

গণেশবাবু তানপুরা শুধু হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, "হাত দুটো কি নামাব দারোগা-বাবু?"

দুঃখবাবু পড়ার ঘরের দরজায় খিল এঁটে জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখছেন। তাঁর পাশে সরোজ, মনোজ, পুতুল।

সরোজ বলল, "পিস্তল?"

মনোজ বলল, "পিস্তল।"

পুতুল বলল, "পুতুলের বাক্সে ছিল।"

দুঃখবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আঃ, গোল কোরো না। ইম্পর্ট্যান্ট কথা হচ্ছে সব, শুনতে দাও।"

গোলযোগ শুনে পাড়ার লোকও এসে জড় হয়েছে কম নয়। তবে তারা একটু দূরে দূরে।

নিশিকান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, "শুনুন রাখোবাবু, আসল অপরাধীকে কোনোদিন বাইরে থেকে চেনা যায় না। আমাদের ক্রিমিনোলজিতে দেখবেন, বেশির ভাগ অপরাধীই দেখতে এবং আচরণে অতি নিরীহ। আর এদের অপরাধ-প্রবণতা অনেক নিকট আত্মীয়স্বজনও টের পায় না। কাজেই ভজবাবুকে আপনারা যত নির্দোষ ভেবে এসেছেন ততটা মোটেই নয়। এ শহরের অন্তত দশ বারোজন লোক ভজবাবুর শিকার হয়েছেন। প্রত্যেকেই অল্পের জন্য বেঁচে যান। এমন কী, আমার একটা সেপাইকে পর্যন্ত তিনি দশবার ওঠবোস করিয়েছেন। আর কী করেননি শুনি! হরশঙ্কর গয়লাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন, সে হাতে পায়ে ধরে বেঁচে যায়। ইউরোপিয়ান ক্লাবে গিয়ে গুলি ছুঁড়েছেন, গোবিন্দবাবু আর শার্দুলবাবুকে আধমরা করেছেন, বাজারেও গিয়েছিলেন কাকে যেন তাক করতে। সবাই এসে থানায় রিপোর্ট করেছে। আমরা ইয়ার্কি করতে আসিনি রাখোবাবু। বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে, ভজবাবুকে বের করে দিন।"

রামু এতক্ষণ বারান্দায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। চেঁচামেচি শুনে উঠে এসে বলল, "ভজবাবু? ভজবাবু তো সেই সন্ধ্যাবেলা পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বললেন কী, আজ সব গুন্ডা বদমাশ আর খারাপ লোককে ঢিট করে আসবেন।"

রাখোবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "তা সেটা এতক্ষণ বলিসনি কেন?"

রামু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হরশঙ্কর পাহলোয়ান আমাকে এমন ঘিস্‌সা দিল কি আমার তবিয়ৎ খারাপ হয়ে গেল।"

দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাখোবাবু, এ লোকটার নামই কি রামু?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এর নামেও একটা মোষ চুরির নালিশ আছে। এ আজ হরশঙ্করের একটা দুধেল মোষ চুরি করে এনে আপনাদের গোয়ালে বেঁধে রেখেছিল।"

এই বলে দারোগাবাবু তাঁর সিপাইদের দিকে ফিরে বললেন, "লোকটাকে আগে সার্চ করে দেখ আর্মস আছে কিনা। তারপর অ্যারেস্ট করো।"

শুনে রামু সটান মাটিতে শুয়ে চেঁচাতে থাকে, "হনুমানজীকে কিরিয়া হো পুলিশ সাহেব, চোরি আমি কভি করি না।"

নিশিকান্ত সে কান্নায় কর্ণপাত করলেন না। রাখোবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "ভজবাবু বাড়িতে নেই বলছেন?"

রাখোহরিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কথায় বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখতে পারেন।"

"সে তো দেখতেই হবে। তবে আমার ভয় হচ্ছে, এখনো যদি না ফিরে থাকেন তবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আরো কয়েকজনকে খুন করেছেন বা করছেন ভজবাবু।"

ঠাকুমা ডুকরে উঠে বলেন, "না না, সে যে মশা মারতে মায়া করে।"

ঠাকুরঝি পরিষ্কার গলায় বললেন, "দ্যাখো বাবা দারোগা সার্চ করার সময় জুতো পরে ঘরে ঢুকতে পারবে না বলে দিচ্ছি। তোমার সেপাইদেরও জুতো খুলতে বলো। এই রাতে গোবরছড়া দিয়ে মরব নাকি, সে হবে না।।"

✱

এদিকে তখন ডাকাতে কালীবাড়িতে ভজবাবু হাড়িকাঠে পড়ে আছেন। একটা জোয়ান ডাকাত রামদা হাতে দাঁড়িয়ে। বাজনদাররা বলির বাজনা বাজাচ্ছে। দৃশ্যটা সহ্য করতে

পারছেন না ভজবাবু। কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইচ্ছে করে যে অজ্ঞান হওয়া যায় না সেটা বুঝে মা কালীকে ডাকতে লাগলেন। একমনে বলতে লাগলেন, "আমাকে অজ্ঞান করে দাও মা।"

একটা ঝাঁকড়া চুলওলা ডাকাত আর একটার কানে গোঁজা বিড়ি নিয়ে খেয়ে ফেলেছে বলে দুজনে খুব ঝগড়া হচ্ছিল। পা-পোড়া মোটা ডাকাতটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। ডাকাতের মেজো সর্দার সেই সুন্দরমতো ছেলেটা ভজবাবুর পিস্তলটা নিয়ে আমোদ করার জন্যই গোটা দুই দুমদাম গুলি ছুঁড়ল আকাশের দিকে।

ভজবাবুর বড় তেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকটা চড়চড় করছে। প্রাণপণে বললেন, "জল।"

বিড়ি-চোর ডাকাতটা সবচেয়ে কাছে। সে ভজবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "চোপ! যার বলি হবে তার আবার অত কথা কী? আর ক মুহূর্ত পরেই সব খিদে তেষ্টা মিটে যাবে।"

ওপাশ থেকে কানাই জিজ্ঞেস করল, "কী বলছে রে বাজাড়ুটা?"

"জল চায়।"

কানাইয়ের মায়া হল, বলল, "দে না একটু।"

খাঁড়া হাতে লোকটা খাঁড়া নামিয়ে বলল, "ওরে, তোদের আর কতক্ষণ লাগবে। বলি দিবি বলে ফেলে রেখেছিস লোকটাকে তো দেরি করছিস কেন? লোকটার এভাবে পড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?"

বিড়ি-চোর ডাকাতটা ঘটি করে জল আনছিল, সুন্দর মতো ছেলেটা চোখের ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করে এক গ্লাস শরবত নিয়ে গিয়ে কাছে বসে ভজবাবুকে বলল, "হাঁ করুন।"

ভজবাবু চোখ বুজে রেখে হাঁ করলেন। ডাকাতটা তাঁর মুখে খানিকটা শরবত ঢালতেই শিউরে উঠে বিষম খেলেন ভজবাবু, খানিকটা পেটে গেল, খানিকটা ফেলে দিয়ে বললেন, "এ কী রে বাবা, এ তো জল নয়।"

"জলের চেয়ে দামী জিনিস। আর একটু খান। আজকের দিনে খেতে হয়। আমরা সবাই খাচ্ছি তো।"

তেষ্টায় বুক কাঠ, না খেয়ে করেন কী ভজবাবু! আবার হাঁ করে আর একটু মুখে নিয়ে চুকচুক করে খেলেন। এবার অতটা খারাপ লাগল না। আবার খেলেন। আবার।

কিছুক্ষণ পরে চোখে ঘোর-ঘোর দেখতে লাগলেন। শরবতের মধ্যে কী ছিল কে জানে, ভজবাবুর মাথাটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যেতে লাগল। ভয়ডর কেটে গিয়ে ঠান্ডা শরীরটা গরম হয়ে উঠতে লাগল। খুব একটা তেজ এল মনের মধ্যে। হাড়িকাঠে গলা দিয়েও হঠাৎ হুংকার ছাড়লেন, "সব ব্যাটাকে দেখে নেব! সব ব্যাটাকে দেখে নেব!"

সেই হুংকার শুনে রোগা আর ভিতু ডাকাতরা একটু দূরে সরে বসল। মেজো সর্দার ভজবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "এই তো চাই। এ না হলে বাপের ব্যাটা! তা ভজবাবু, আজ চলুন না আমাদের সঙ্গে ডাকাতি করতে, দেখি কেমন সাহস আপনার।"

ভজবাবু একটা ফুঃ করে বললেন, "এ আর কী কথা! এক্ষুনি চলো। কার বাড়ি লুট করবে?"

"রাজবাড়ি।"

"আরে দূর দূর। রাজবাড়িতে আছে কী? আছে একটা ঘুঁটের পাহাড় আর নটে শাকের জঙ্গল। রাজাদের কি আর সেই দিন আছে! লুটবে তো চলো একটা ব্যাঙ্ক লুট করি।"

"না। আমরা আজ রাজবাড়ি লুট করব ঠিক করেছি। সেখানে মাটির নীচে অনেক টাকা আছে। ভয় পাবেন না তো ভজবাবু?"

ভজবাবু হাড়িকাঠে শুয়ে থেকেই খুব হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন, "ভজহরি কখনো ভয় কাকে বলে জানে না। হাড়িকাঠের খিলটা খুলে আমার হাতে একটা পিস্তল দাও, তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেজো সর্দার বলল, "আমরা পিস্তল বন্দুক রাখি না। বড় সর্দারের একটা বন্দুক আছে, কিন্তু তার আজ বড় আমাশা হয়েছে বলে সে যাচ্ছে না। আর আপনার এ পিস্তলেও আর গুলি নেই।"

"ছ্যাঃ ছ্যাঃ কেমন ডাকাত হে তোমরা যে পিস্তল-বন্দুক রাখ না। ঠিক আছে, দারোগাবাবুকে বলে আমি তোমাদের পিস্তলের বন্দোবস্ত করে দেব। আমাকে আজকের মতো একটা রাম দা-ই দাও, কী আর করা!"

মেজ সর্দার হাড়িকাঠের খিল খুলে দিতেই ভজবাবু লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে বললেন, "অ্যাটেন-শন।"

সেই চেঁচানিতে ডাকাতরা আবার ভয় খেয়ে চমকে উঠল। মেজো সর্দার হেসে বলল, "তোরা সব সোজা হয়ে দাঁড়া। আজ ভজবাবুই আমাদের সর্দার।"

ভজবাবুও মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাৎ আমি সর্দার। এই কানাই, রামদা দে একটা।"

কানাই ভয়ে ভয়ে একখানা রামদা এগিয়ে দিতেই ভজবাবু সেটা হাতে নিয়ে তিন চারটে লাফ মেরে বই-বই করে ঘোরালেন চারদিকে। তারপর একগাল হেসে বললেন, "দেখলে তো সবাই!"

সবাই তারিফ করে বলল, "বাঃ! বহুৎ খুব!"

ভজবাবু গম্ভীর হয়ে আর একটা হুংকার দিয়ে বললেন, "এক বাটি মাংস নিয়ে আয়।"

বিড়ি-চোর একবাটি ভর্তি মাংস নিয়ে এল। ভজবাবু রামদা পাশে নিয়ে বসে বললেন, "তোরাও বসে যা। রাতে অনেক কাজ আছে।"

(ক্রমশ)

টিন ! টিনের গল্প

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

না, টিনটিনের গল্প নয়, টিনের গল্প। টিন ধাতুর গল্প। তবে তাতে ক্ষতি নেই, টিনটিনের গল্পের মতোই রোমাঞ্চকর এই টিনের গল্প। একটা উলটোপালটা প্রশ্ন করি। ১৮১১ সালে রাশিয়া জয় করতে গিয়ে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কেন হেরে গিয়েছিলেন, জান কি? উত্তরে বলতে হয়, বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের এই বিপর্যয়ের মূলেও টিনটিনের মতোই খামখেয়ালি স্বভাবের এই টিনের কিছু ভূমিকা ছিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যদের পরনে ছিল ভারী গরম কোট, পায়ে ইয়া বুট। রাশিয়ার হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্য সরঞ্জামের অভাব ছিল না। কিন্তু ঘাটতি ছিল এক জায়গায়। সৈন্যদের গরম কোটের বোতাম ছিল টিনের তৈরি, যে টিন ১৩ ডিগ্রী সেনটিগ্রেড তাপমাত্রার নীচে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে 'ধূসর টিনে' (গ্রে টিন) রূপান্তরিত হয়। এই 'ধূসর টিন' মুচমুচে বিসকুটের মতোই ভঙ্গুর। ফলে রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে (যা শীতকালে হিমাংকের অনেক নীচে চলে যায়) নেপোলিয়ানের সৈন্যদের কোটের বোতাম ভেঙে চুরচুর। তারপর ঐ হিমঠাণ্ডায় রংকাইটিস হয়ে মারা গেল প্রায় আধেক সৈন্য, বাকি যারা প্রাণে বাঁচল, তাদেরও আর যুদ্ধ করবার উৎসাহ বা শক্তি কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কোনরকমে পালিয়ে সে যাত্রা প্রাণে বাঁচল তারা। নেপোলিয়ান সেবার যুদ্ধে হারলেন রসায়ন শাস্ত্রের এই সরল সত্যটির হদিশ রাখতেন না বলে।

যে টিনের খামখেয়ালিপনার জন্য নেপোলিয়ানের যুদ্ধে এমন পরাভব, তার প্রকৃতি কিন্তু এমনিতে খুবই নমনীয়। একে পিটিয়ে ছাতু করে খুব পাতলা পরতে পরিণত করা অসম্ভব নয়। ভাঙা বাসনপত্র বা ধাতুর তৈরি খেলনাপত্র জুড়তে ঝালাইয়ের কাজে লাগলেও টিনের মূল ব্যবহার কিন্তু টিন প্লেট তৈরিতে। ইসপাতের পাতলা চাদরের ওপর তরল টিনের প্রলেপ লাগিয়ে তৈরী হয় টিন প্লেট। এই টিন প্লেটেই সারা পৃথিবীতে তৈরী হচ্ছে লাখো-লাখো টিনের কৌটো, যা আজ প্যাকিং শিল্পের মূল বনিয়াদ। ওষুধপত্র থেকে শুরু করে রসগোল্লা প্যাকিংএ পর্যন্ত টিনের কৌটো লাগে। শিল্পী রদাঁ বা হেনরি মুরের ভাস্কর্যের উপাদান যে ব্রোঞ্জ, তা প্রস্তুত করতে তামার সঙ্গে মিশেল দিতে হয় টিন। এই ব্রোঞ্জ তৈরীর ইতিহাস ঘাঁটলে আমাদের চলে যেতে হবে ৩৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। তৎকালীন মিশরের একটি ব্রোঞ্জের রড পরীক্ষা করে শতকরা প্রায় ৯ ভাগের মতো টিন পাওয়া গেছে। অর্থাৎ সেই প্রাচীন কালেও মানুষ আবিষ্কার করেছিল টিনের আকরিক, এই ধাতুটি ব্যবহার করতে শিখেছিল নিজের প্রয়োজনে। প্রাচীন ভারতের মহেনজোদড়ো এবং হরপ্পা থেকেও ব্রোঞ্জের তৈরি অলংকার, অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেছে।

প্রকৃতির উদার বুকের গভীরে কাঁচা টিন বিশুদ্ধ অবস্থায় মেলে না, যা মেলে তা হল টিনের প্রধান আকরিক ক্যাসিটেরাইট বা টিনস্টোন। রসায়নবিদের ভাষায় টিন অকসাইড অর্থাৎ টিন আর অকসিজেন গ্যাসের সমন্বয়। এতে টিনের পরিমাণ শতকরা ৭৯ ভাগের মতো। ক্যাসিটেরাইট দেখতে ঝকঝকে, শরীরের রং কখনো গাঢ় বাদামী, সবুজ বা লাল, আবার কখনো বা কালো। কাঁচের মতোই কঠিন, তবে দারুণ ভারী, জলের প্রায় সাতগুণ।

গলিত ম্যাগমা নিঃসৃত তপ্ত-জল-জাত ক্যাসিটেরাইটের আদি জন্মভূমি গ্র্যানাইট জাতীয় পাথর। তবে পৃথিবীর বড় বড় টিনের খনির অবস্থান নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, যেখানে আদি জন্মস্থান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ক্যাসিটেরাইট আশ্রয় নিয়েছে। রোদ-জল-হাওয়ার সংস্পর্শে টিনসমৃদ্ধ গ্র্যানাইট বা আনুষঙ্গিক পাথরে ভাঙন ধরলে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মেই ভারী টিনের আকরিক নদীনালার স্রোতের সঙ্গে পরিক্রমা করে খানিকটা পথ। তবে নিজের ভারী দেহের জন্য দীর্ঘ পথ পেরোতে পারে না। আস্তার আসর জমায় জন্মভূমির অদূরেই। মালয়েশিয়ার টিনের খনিজ ভাণ্ডার, আয়তনে যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়, তারও জন্ম এভাবেই। এই খনিজ ভাণ্ডার দৈর্ঘ্যে ১৬০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ২০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি। মালয়েশিয়া ছাড়াও বলিভিয়া, চীন ও ইংল্যাণ্ড টিন উৎপাদনে অগ্রণী।

ভারতে বড় আকারের খননযোগ্য টিনের খনিজ ভাণ্ডার না থাকলেও বিহারের রাঁচি হাজারিবাগ ও গয়া জেলা এবং গুজরাটের পালানপুর ও বনসকণ্ঠ জেলায় সামান্য কিছু ক্যাসিটেরাইটের সন্ধান মিলেছে। তবে এর কোনটিই আপাতত লাভজনক নয়। সুতরাং ভারতকে নিজের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে বাৎসরিক প্রায় দশ কোটি টাকার টিন আমদানির ওপর।

তিনটি চড়ুই ও রুমনি

সুব্রত চক্রবর্তী

একটা চড়ুই কুটো আনে,
আরেক চড়ুই খড়—
দুজন চড়ুই মিলেমিশে
বানায় তাদের ঘর।

আরো একজন চড়ুই আছেন,
ঈষৎ গরবিনী—
একটু দূরে, ঘাড় ফুলিয়ে
বসে থাকেন তিনি।

ঘর বানানো সাঙ্গ হলে
কার্নিসে ও গাছে,
উড়ুৎ-ফুরুৎ—দেখন-ঘুরুৎ—
তিন চড়ুইয়ে নাচে!

একলা-ঘরে রুমনি কখন
চড়ুইদের বাড়িতে
ছোট্ট হাতে টাঙিয়ে দিল
লাল টুকটুক ফিতে!

মেরু-রহস্য

উৎরাইয়ের মাঝপথে একটা আস্তানায় এসে থামল দলটি......
এবার কী হবে?
খাবার বোধ হয়।
যাক, তাহলে না-খেয়ে মরতে হবে না।
বিশ্রামের পর...আবার শুরু হল যাত্রা...
বুঝতে পেরেছি বিদেশী আক্রমণকারীদের সম্পর্কে কেন এত সন্দেহ এদের।
কেন?
এরা হচ্ছে হাজার বছর আগেকার একদল ভাইকিংয়ের বংশধর। এই জায়গাটাকে তারা বলত 'আস্ত্রাগার্দ'। আর এই নির্জন জগতে, তাদের মতে, এটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা।
কিন্তু, ওদের নাকি দৈববিশ্বাস যে বিদেশী বর্বরেরা এসে একদিন ওদের এই স্বর্গ জয় করে নেবে...
আর ওরা ভাবছে আমরাই সেই বর্বরদের প্রথম দল!
হঠাৎ...তাদের চোখের সামনে দেখা দিল 'আস্ত্রাগার্দ'।
লোকটা বলছে ওই সেই খামারবাড়ি, ডোনাল্ড যেখানে আছে।
নীচে নেমে আসতে...রস্‌কে চমকে দিয়ে চাষীর মেয়ে হঠাৎ ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল...
আচ্ছা! আপনিই ডোনাল্ডের বাবা? ও-তো বাবাকে আর আমাকে আপনাদের ভাষা শিখিয়েছে।
কোথায় আমার ডোনাল্ড?
ওরা...ওরা তো আজ সকালে তাকে নিয়ে গেছে।

এর পর আগামী সংখ্যায়

এপ্রিল ফুলের ম্যাজিক

জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

এপ্রিল মাসে "এপ্রিল ফুল।" কিন্তু সে তো পয়লা এপ্রিলের ব্যাপার। যাকগে, সামনের বছরেও তো পয়লা এপ্রিল থাকবে। তখনকার কথা ভেবে এবারে তোমাদের আমি এপ্রিল ফুল করার ম্যাজিক শেখাব। এটা একটা ছোট্ট হিসেবের ম্যাজিক, তবে মোটেই কঠিন কিছু নয়। ঠিকমত দেখাতে পারলে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

ম্যাজিকটা কিছু দিন আগে আমি আমার এক ছোট্ট বন্ধু অমিতকে দেখিয়েছিলাম। অমিতকে জব্দ করা ভীষণ মুশকিল, কারণ পৃথিবীর সব কিছু ও যেন জেনে বসে আছে। একটা কিছু করতে গেলেই ও আগের থেকেই গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে, ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে। কিন্তু এই ম্যাজিকটায় ও একেবারে জব্দ।

প্রথমে দর্শককে বল তিন সংখ্যার একটা নম্বর লিখতে। তার প্রথম এবং শেষ সংখ্যাটার তারতম্য যেন একের বেশি হয়। এবার ওই নম্বরটা উলটিয়ে নিয়ে প্রথম নম্বরের তলায় লিখে বিয়োগ করতে হবে। উলটোবার পরে যদি সংখ্যাটা বড় হয়ে যায় তাহলে ওপরে লিখে বিয়োগ কর। এবার উত্তরটা যা হল তার ঠিক নীচে ওই উত্তরের নম্বরটাকে উলটিয়ে লিখে সে-দুটো যোগ করতে বল। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল কী? ধরা যাক প্রথমে সংখ্যাটা নেওয়া হয়েছিল ৩২১। সেটাকে উলটিয়ে নিলে হল ১২৩। ওই ৩২১ থেকে ১২৩ বিয়োগ করলে হয় ১৯৮। এখন ওই উত্তরটাকে উলটে দিলে হচ্ছে ৮৯১। আমি ওই ১৯৮-এর সঙ্গে ৮৯১ যোগ করতে বলছি। আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ।

এবার যে যোগফল দাঁড়াল তার পেছনে ছটা শূন্য লাগিয়ে ৭৩৩, ৩৬১, ৫৭৩ এই সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ করতে বল। এত ঝকমারি দেখে তোমার দর্শক নিশ্চয়ই খুব খেপে যাবে। তখন তাকে সামলে নিয়ে বল, এটা যে-সে ম্যাজিক নয়। এটা হচ্ছে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ম্যাজিক এবং এতে একটু কষ্ট করতেই হবে। দর্শক সেই বিয়োগটা ঠিকমত করার পরে তুমি বলবে, অনেক খাটা-খাটুনি হয়েছে ঠিক, কিন্তু আসল কাজটা করা হয়ে গেছে। এই এত যোগ বিয়োগ করে যে সংখ্যা পাওয়া গেল তা কোনোমতেই তোমার অর্থাৎ জাদুকরের জানা সংখ্যা নয়। দর্শকের ইচ্ছেমত সংখ্যা থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। তা যাই হোক না কেন, এই উত্তরটা আসলে হচ্ছে একটা বার্তা বা সংবাদ। সংখ্যাগুলির মানে খুঁজে পেলেই সেই সংবাদ পড়া যাবে। সংখ্যাটাতে যদি কোনও ৩ থাকে তো তার তলায় "L" লিখতে বল, প্রত্যেকটা ৫-এর তলায় "O" এবং ৬-এর তলায় "F", ৮-এর তলায় "I", ৪-এর তলায় "R", ২-এর তলায় "P" এবং ৭-এর তলায় "A" লিখে সংখ্যাটাকে একজন দর্শককে সেটা উলটো দিক থেকে পড়তে বল, দেখবে সে কেমন জব্দ হয়ে গেছে। কারণ ওইভাবে পড়লে লেখাটা দাঁড়াবে "APRIL FOOL".

তোমরাও নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ, ভাবছ, এটা কীভাবে সম্ভব! আসলে এটা হচ্ছে একটা অঙ্কের ম্যাজিক। আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেইভাবে হিসেব করলে সব সময়েই দেখবে উত্তরটা ঠিক এক হচ্ছে।

এই খেলাটা তোমরা আবার অন্যভাবেও দেখাতে পার। প্রথমে সেই একইভাবে বল তিন সংখ্যার একটা নম্বর লিখে সেটা উলটিয়ে বাদ দিতে। উত্তরটাকে উলটিয়ে ওই আগের মতই আবার যোগ করতে বল। যোগফল যা দাঁড়াল তার সঙ্গে আবার ৯ যোগ করতে বল। এবার ওই সংখ্যাটাকে এক লক্ষ থেকে বিয়োগ দিতে বল। খেয়াল করে দেখবে, এই বিয়োগ ফল সব সময়েই ৯৮৯০২ হচ্ছে। তুমি যে উত্তরটা জান, বলবে না কিন্তু। এবার যাকে জব্দ করতে চাও তাকে বল উত্তরের প্রত্যেকটা ৯-এর তলায় I লিখতে, ৮ এর তলায় D লিখতে ০ গুলো ০ই থাকবে, কিন্তু ২ এর তলায় T লিখতে হবে। দেখবে লেখাটা হয়ে গেছে "IDIOT"

হ্যাঁ, একটা কথা, এই খেলাটা কিন্তু সত্যিকারের ইডিয়ট বা বন্ধুদের দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ তারা যোগ বিয়োগে ভুল করলে ম্যাজিকটা হবেই না। আর একটা জিনিস খেয়াল রেখো, প্রথম তিন সংখ্যার নম্বরটার প্রথম এবং শেষ সংখ্যার তারতম্য যেন একের বেশি হয়। তা না হলে ম্যাজিক কিন্তু হবেই না।

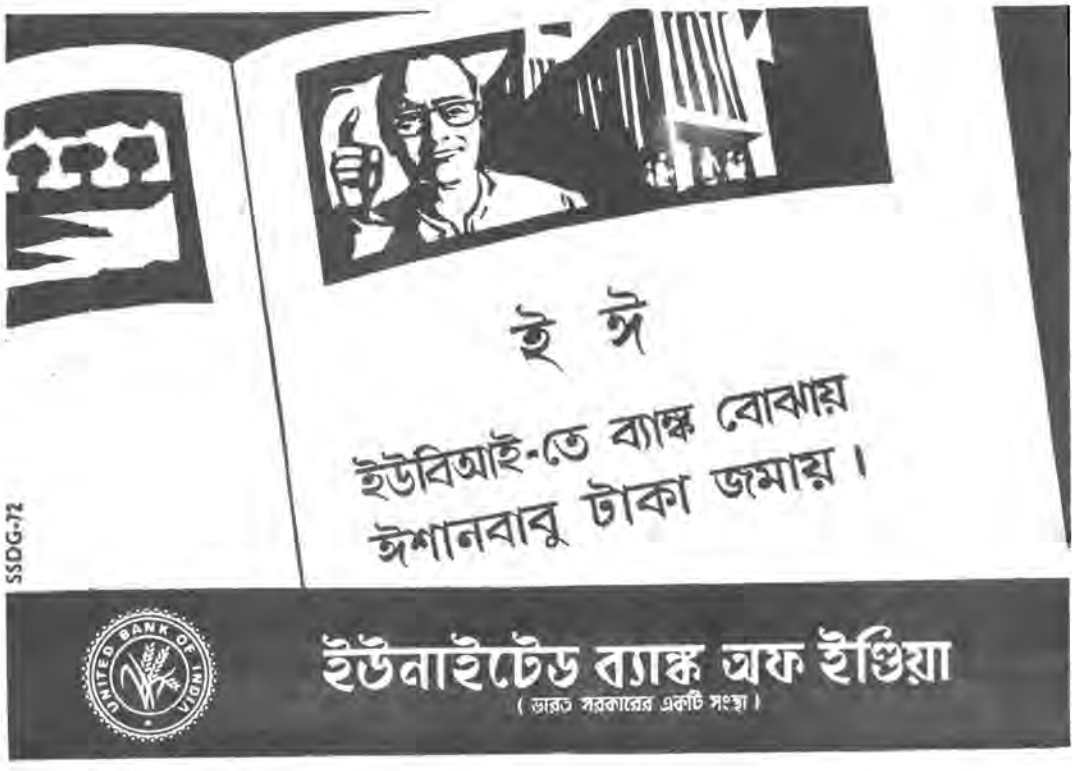

ডোডো তাতাই

লেখা / তারাপদ রায়
রেখা / কৃত্তিবাস রায়

সাইকেল চালানো রীতিমত কঠিন কাজ। যে পারে সে পারে, যে পারে না সে পারে না। তাতাইবাবু কিছুতেই এই সাইকেলের ব্যাপারটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। সাইকেল চালাতে না-জানলে জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যতবারই চেষ্টা করেন, দু-চার হাত এগোতে না এগোতেই, কাটা কলাগাছের মত, হয় বাঁয়ে না হয় ডাইনে ঝুপ করে পড়ে যাচ্ছেন। হাত ছড়ে গিয়েছে, পায়ের হাঁটু থেঁতলে রক্ত বেরিয়েছে, তবু তাতাইবাবু হাল ছাড়েননি, মানে সাইকেলের হ্যান্ডেল ছাড়েননি।

বাড়িতে বিস্তর গালাগাল, রাস্তায় বন্ধুদের পরিহাস। কোনো কিছুতেই তাতাইবাবু থেমে যাননি। একমাত্র সান্ত্বনা যে, ডোডোবাবুও সাইকেল চড়া জানেন না। তা ছাড়া, তাতাইবাবুর মতে ডোডোবাবু ভিতুর ডিম, সাইকেলের ধারে-কাছে যাওয়ার সাহস তাঁর নেই। সাহসের অভাব হলেও ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে উত্তেজিত করতে পিছপা নন। এই উত্তেজনার জন্যেই হোক বা অধ্যবসায়ের ফলেই হোক একদিন দেখা গেল তাতাইবাবু সাঁই-সাঁই করে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন, পিছনে পিছনে ঊর্ধ্বশ্বাস ডোডোবাবু। প্রায় শ'খানেক গজ তীরগতিতে গিয়ে সাইকেলসুদ্ধ তাতাইবাবু গিয়ে পড়লেন এক বৃদ্ধা মহিলার গায়ে। সুখের বিষয়, কারোই বেশি চোট লাগেনি, বৃদ্ধাও বাচ্চা ছেলে দেখে কিছু না বলেই তাতাইবাবুকে রেহাই দিলেন।

এখন নতুন সাইকেল চড়া শেখার আনন্দে রাত নেই, দিন নেই তাতাইবাবু রাস্তায় পাক খাচ্ছেন, বারবার পড়ে যাচ্ছেন, ধুলো ঝেড়ে উঠে আবার ধাবমান হচ্ছেন। এবং এইভাবেই ঠিক পরের পরের দিন প্রথম দিনের দুর্ঘটনার জায়গায় সেই একই বৃদ্ধাকে তাতাইবাবু দ্বিতীয়বার চাপা দিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা সহজে মিটল না। "একই ছেলে আমাকে দুবার চাপা দিল গো" বলে কপাল চাপড়িয়ে বৃদ্ধা ক্রন্দন শুরু করলেন। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে ডোডোবাবু চম্পট, তাতাইবাবুও তড়িৎ-গতিতে সাইকেলটি তুলে নিয়ে সাঁই-সাঁই করে পালালেন।

হাতিঘোড়া

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পুণ্যিপুকুর পুষ্করিণী
জলদাপাড়ায় খুব ঘুরিনি
বন ঘুরেছি হাতির পিঠে
আম খেয়েছি কাঁচায় মিঠে
পাকলে দেখি পান্সা আম
তাতার গেলেন মিহিজাম
মিহিজামের হোমিওপ্যাথি
করলো বটে দিনকে রাতি
পাহাড় তো নয় পাম্সু জুতো
তাতার দিলেন আয়সা গুঁতো
পাহাড় সারায় মুচির মা
আমের আঠায় জামের গা
সেই তাতারের সঙ্গে কার
জোরজুলুম আর ঘুষির ধার
আমি তো ভাই এইটুকুনি
কাজের কাজী, নই ধুচুনি
নাচতে পারি গাইতে পারি
নৌকো পেলে বাইতে পারি
অল্প জলে নাইতে পারি
আর যা পারি বলবো না
হাতির পিঠে হাওদা পেলে
আর ঘোড়াতে চড়বো না॥

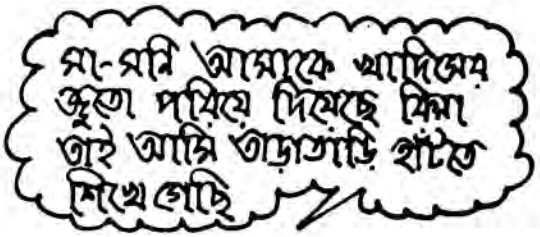

মণিমেলার খবর

মণিমেলা মহাকেন্দ্র আয়োজিত ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ৩০ জানুয়ারি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মণিমেলা থেকে দ্বিশতাধিক শিশু শিল্পী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ছবি আঁকা ও আলপনায় পুরস্কার পেয়েছে : মারফি চক্রবর্তী, সৌরজ্যোতি বসু, ফিরোজ খান, সুস্মিতা ধর, নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়ন বসু, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা পাল, জয়জিৎ বসু, বিজিত কুমার, কুমারজ্যোতি রায়চৌধুরী, দিব্যেন্দু পাল, সুপর্ণা সাহা, গৌতম মন্ডল, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা রায়, উৎপল মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুকুমার, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেবী হালদার।

ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন মণিমেলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪১তম জন্মদিবসটি যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। পরলোকগত রাষ্ট্রপতি আমেদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মণি ভাই-বোনেরা। এই মাসেই সর্বত্র আঞ্চলিক মণি সমাবেশ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অঞ্চলেই মণিমেলাগুলি ক্রীড়া প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করে। জেলাভিত্তিক আন্তঃ মণিমেলা স্পোর্টস তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আগামী বছর থেকে জেলা স্পোর্টসের বিজয়ীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ

দমদম অঞ্চলের আন্তঃ মণিমেলা কুচকাওয়াজ ও ছড়ার ব্যায়াম প্রতিযোগিতা উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় প্রতিযোগিতাতেই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে পূর্বাচল ও মৌসুমী মণিমেলা।

মণি সন্দেশ

বসিরহাটের সাম্প্রতিক শোচনীয় বাস দুর্ঘটনায় স্থানীয় রক্তরবি মণিমেলা আহতদের ত্রাণকার্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

কলকাতার কসবা মণিমেলার ৩৫তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে মণি ভাই-বোনেরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। হাওড়ার স্বামীজী মণিমেলার ভাই-বোনেরা সম্প্রতি কামারপুকুর ও জয়রামবাটী ঘুরে এল। এই মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা দুটি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ পরগনার দক্ষিণ বারাসত মণিমেলা এক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দেড়শতাধিক শিশু ও কিশোর-কিশোরী বিভিন্ন বিষয়ে অংশ নেয়। রায়গঞ্জের শুভশ্রী মণিমেলার ভাই-বোনেরা সম্প্রতি প্রাচীন বাংলার রাজধানী মালদহের গৌড়ে শিক্ষাভ্রমণে গিয়েছিল। বার্নপুরে বেণী স্মৃতি মণিমেলা, যাদবপুরের রাজাপুর মিলনী মণিমেলা এবং ২৪ পরগনার গরিফা ও নবমিতালী মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিজ নিজ মণিমেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ পরগনার আতপুর বৈশাখী মণিমেলা এক শিক্ষাভ্রমণে মুর্শিদাবাদ ঘুরে এল।

বাঁদরামি

জিতেন্দ্রিয় দাশগুপ্ত

লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরগুলি
মারছে ছুঁড়ে গোলাগুলি,
একটা এসে লাগল মাথায় ফট্ করে।
উল্টে গেল চোখের মণি
হাসপাতালে চল্ এখনই
নইলে কখন্ অক্কা পাবি ঝট্ করে।

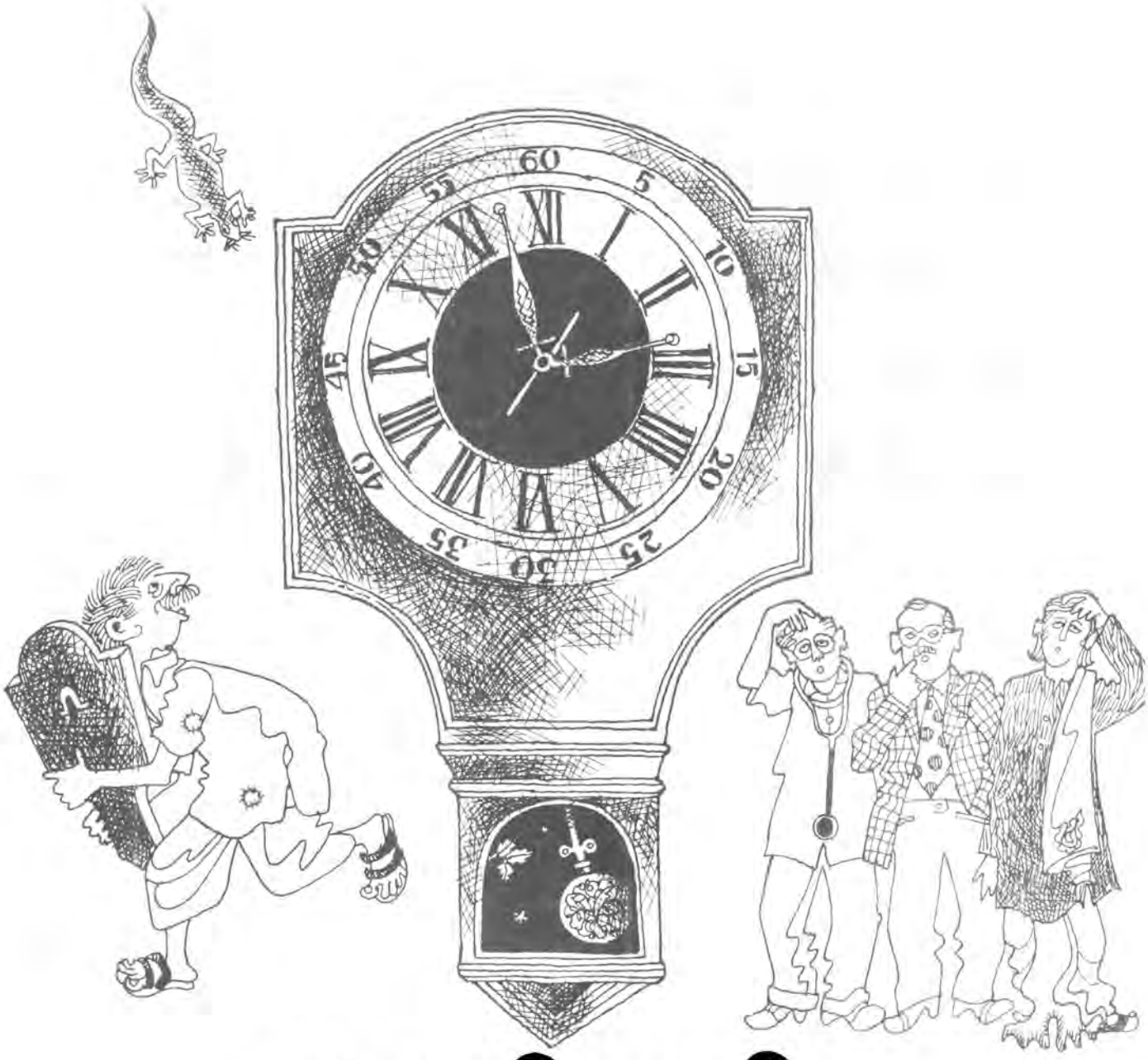

রায়বাড়ির ঘড়ি

অজেয় রায়

কলকাতায় ভবানীপুরে রায়বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার হচ্ছে এলাহি। সাবেক কালের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। বাড়িতে থাকেন তিন কর্তা। তাঁদের তিন গিন্নী। তাঁদের গুটি পাঁচ-ছয় ছেলেমেয়ে। গাদাগাদা পুষ্যি আত্মীয়স্বজন এবং এক পাল চাকর-ঝি। লোকজনের আনাগোনায় রায়বাড়ি সর্বদা সরগরম। বাড়ির বাসিন্দারা সবাই সবাইকে ভাল করে চেনেই না। কে আসছে, কে যাচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে।

বড়, মেজো, ছোট—তিন রায়-কর্তাই খুব ব্যস্ত মানুষ। বড় রায় ডাক্তার। তা ছাড়া তিনি পাঁচ-সাতটি স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি প্রভৃতি নানা পদ অলংকৃত করে আছেন। ফলে রোগী দেখার পর বাকি সময়টুকু তিনি ওই ক্লাবগুলিকে নিয়েই বিব্রত থাকেন।

মেজো রায় কোম্পানির ডিরেক্টর। কোম্পানির লাভ-লোকসান ছাড়া তাঁর মগজে অন্য চিন্তা ঢোকার সুযোগ খুব কম।

ছোট রায় কলেজে পড়ান। বাকি সময় করেন সমাজসেবা। দলবল জুটিয়ে হৈ-হৈ করে, আজ বন্যাত্রাণ, কাল বস্তি উন্নয়ন, পরশু মেলায় ভলাণ্টিয়ারি করে বেড়াচ্ছেন। সংসারের ঝক্কি পোয়ানোর সময় কই?

যা হোক, রায়বাড়ির চাকা দিব্যি গড়িয়ে চলেছে।

তিন রায়গিন্নী বেজায় চৌখস। কর্তাদের ভরসা তাঁরা করেন না। আর আছেন ভুবনবাবু। বুড়োকর্তা অর্থাৎ বর্তমান রায়দের বাবার আমলে তিনি ছিলেন জমিদারির নায়েব। এখন জমিদারি নেই। ভুবনবাবু কলকাতায় থেকে রায়দের যাবতীয় বৈষয়িক ধকল সামলান।

রায়কর্তারা কিন্তু মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন। ছোটখাট বিষয়ে জোরালো মতামত প্রকাশ করে বাড়িতে নিজেদের মান রক্ষার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক কর্তারই ধারণা, তাঁর অন্য দুই ভাই ঘোর অপদার্থ, সংসারের দিকে মোটে হুঁশ নেই। ভাগ্যিস তিনি একটু-আধটু নজর দেন এদিকে, নইলে সব গোল্লায় যেত। অবশ্য গিন্নীরা কর্তাদের সাংসারিক বুদ্ধি নিয়ে আড়ালে হাসা-হাসি করেন, আর ভুবনবাবু তো কর্তাদের পাত্তাই দেন না।

শনিবার দুপুর, বেলা প্রায় তিনটে বাজে। রায়বাড়ি নিঝুম। বোঝা যায়, বাড়ির লোকজন ঘুমুচ্ছে বা গড়াচ্ছে। একটা মোটর গাড়ি থামল বাড়ির উঠোনে। বড় রায় ঢুকলেন সদর দরজা দিয়ে। বাইরের ফটকের মত সদর দরজা সর্বদা হাট করে খোলা থাকে। দারোয়ান একজন আছে বটে, কিন্তু সে নিজের কুঠুরিতে বসে খানা পাকায় বা ভজন গায়। মাঝে-মাঝে গোরু-ছাগল ঢুকে পড়লে তাড়ায়। মানুষের আসা-যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বড় রায়ের মিটিং ছিল ক্লাবে। কম মেম্বার উপস্থিত হওয়ায় মিটিং হয়নি, ভেস্তে গেছে। তাই অগত্যা অসময়ে বাড়ি ফিরেছেন।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁপাশে বৈঠকখানা ঘর। ঘরে আছে কয়েকটা পুরনো চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি ইত্যাদি আসবাব। দরজা থেকে সোজা চোখে পড়ে দেওয়ালে ঝোলানো একটা মস্ত ঘড়ি। তার পেণ্ডুলামটি দিবারাত্রি টকটক করে দুলছে। একটু কম পরিচিত আগন্তুককে এই ঘরে বসানো হয়।

রায়বাবু বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার ভিতরে উঁকি মারলেন।

ফাঁকা ঘর, কেবল একটি লোক পিছন ফিরে মুখ উঁচু করে দেওয়ালঘড়িটা দেখছে। লোকটির গায়ে ময়লা শার্ট ও ধুতি। ছোটখাট চেহারা।

রায় থামলেন। "এই, কে তুমি?"

লোকটি ঘাড় ফেরাল। বোকা-বোকা মুখে কাঁচুমাচু হাসি। "এজ্ঞে ঘড়িটা দেখছি।"

"কেন, ঘড়ির কী হল?"

"এজ্ঞে, মানে টাইমটা ঠিক—"

"ও, তুমি কি ঘড়ির দোকান থেকে এসেছ?"

"এজ্ঞে।" লোকটি হাত কচলাতে-কচলাতে মাথা নাড়ল।

"কে খবর দিল?"

"এজ্ঞে বাবু।"

"কোন্ বাবু?"

লোকটি বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ে। "তা জানি না স্যার, মালিক জানে। আমি কর্মচারী। দূর থেকে দেখেছি বাবুকে। ফর্সা লম্বা। মুখ দেখিনি।"

তিন রায়ই ফর্সা এবং লম্বা। ঠিক কোন্ জন, তা বোঝা গেল না।

বড় রায় বললেন, "কী বলেছে? অয়েলিং করতে? টাইম ঠিক দিচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, বাবু।"

"বাস্ আর কিছু নয়?" রায় রেগে ওঠেন।

"মানে আমি তো ঠিক জানি না, মালিক জানে।" লোকটি ১৮ বেজায় ঘাবড়ে যায়।

বড় রায় জোরে জোরে চিন্তা করেন। "নিশ্চয় কানুর কীর্তি। ও সেদিন বলছিল ঘড়িটা দেড় মিনিট স্লো যাচ্ছে, অয়েলিং করা দরকার, দোকানে খবর দিতে হবে, হুম্।"

কানু হচ্ছে মেজো রায়ের ডাক-নাম।

বড় রায় লোকটিকে বললেন, "এ-ঘড়ির বয়স কত জান? ফর্টি ইয়ারস। চল্লিশ বছর। ওয়াচম্যান অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন্স-এর তৈরি। খাঁটি বিলিতি জিনিস। আজও একেবারে করেক্ট টাইম দেয়। মাত্র দু-এক মিনিট এদিক ওদিক হয় দৈবাৎ। ওটা সমস্যাই নয়। কিন্তু বাজনাটা খারাপ হয়ে গেছে। সেকথা বলেছে কি? প্রত্যেক ঘণ্টায় বিউটিফুল বাজনা বাজত। যেন জল-তরঙ্গের শব্দ। শুধু টাইম ঠিক করে দিলেই বুঝি হয়ে গেল? কানের মাথা খেয়েছে সব। ওহে, তোমার মালিককে বলবে বাজনাটা ঠিক করে দিতে। মনে থাকবে?"

"এজ্ঞে স্যার।"

বড় রায় গটগট করে ভিতরে চলে গেলেন।

ঘড়ির দোকানের লোকটি একটা ভারী কাঠের টেবিল জাপটে ধরে তুলে পা পা করে ঘড়ির নীচে আনছে। তখুনি মস্‌মস করে হেঁটে বৈঠকখানার সামনে থমকে দাঁড়ালেন মেজো রায়। পরনে তাঁর সুটবুট, হাতে জ্বলন্ত চুরুট।

চমকে গিয়ে লোকটি ধড়াম করে টেবিলটা মেঝেয় নামাল।

শনিবার হাফ-ডে হলেও মেজো রায় পুরো অফিস করেন। কিন্তু আজ হঠাৎ অফিস পাড়ায় লোড শেডিং হতে গরমে টিঁকতে না পেরে তিনি পালিয়ে এসেছেন। অফিসের গাড়ি তাঁকে গেটের বাইরে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মেজাজ তেতেই ছিল। কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, "হ্যাল্লো, কে তুমি? কী করছ এখানে? টেবিলটা এত জোরে ফেললে কেন?"

লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এজ্ঞে ঘড়িটা পাড়ব, তাই টেবিল আনছিলাম।"

"কেন পারবে? হোয়াই?"

"ঘড়িটা ঠিক করতে হবে কিনা, তাই দোকানে নিয়ে যাব। আমি ঘড়ির দোকান থেকে আসছি।"

"অলরাইট, টাইমটা ভাল করে অ্যাডজাস্ট করবে, বড় স্লো যাচ্ছে।"

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ স্যার। আর বাজনাটাও ঠিক করতে হবে।"

"বাজনা?" ভুরু কোঁচকালেন মেজো রায়।

লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, "বাবু বলে গেলেন।"

হুঁ, বড়দা বলে গেছে। বড়দার গাড়ি দেখলাম বাইরে। মনে মনে ভাবলেন মেজো রায়। বড়দার কেবল ওই বাজনা নিয়ে যত মাথাব্যথা। হোপলেস।

মেজো রায় গম্ভীর গলায় বললেন, "বুঝলে হে, ঘড়ির আসল ডিউটি হচ্ছে ঠিক সময় দেওয়া। টাইম ফার্স্ট, মিউজিক নেক্স্ট। মাইণ্ড দ্যাট।"

লোকটি হাত কচলাতে কচলাতে জানাল, "হ্যাঁ স্যার।"

দোকানের লোকটির বিবেচনায় সন্তুষ্ট হয়ে চুরুটে লম্বা টান দিয়ে মেজো রায় বাড়ির ভিতরে পা বাড়ালেন।

ঘড়িতে সুবিধেমত হাত পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ উঁচুতে ঝোলানো। কীভাবে কায়দা করে নামানো যায় ভাবছে লোকটি। এমন সময় চটির ফটর-ফটর আওয়াজ। দরজার গোড়ায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত ছোট রায়ের আবির্ভাব হল।

ছোট রায় কলেজ থেকে ফিরছেন। বিকেলে শিক্ষা প্রসার সমিতির মিটিং আছে পাড়ায়, তাই চলে এসেছেন। একজন লোককে টেবিলে চড়ে দু হাতে তুলে ঘড়িটা ধরে বিচিত্র ভঙ্গিতে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন, "কী করছ হে? ঘড়িতে দম দিচ্ছ নাকি?"

থতমত খেয়ে লোকটি বলল, "এজ্ঞে না।"

"তবে?"

"ঘড়িটা দোকানে নিয়ে যাব, তাই নামাচ্ছি।"

"দোকানে কেন?"

"মেরামত করতে হবে। আমি ঘড়ির দোকানের লোক।"

"কে সারাতে বলেছে?" ছোট রায় জানতে চাইলেন।

"এজ্ঞে, বাবু।"

ছোট রায় বুঝলেন, তাঁর দুই দাদার কেউ। জিজ্ঞেস করলেন, "বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

লোকটি ঘাড় কাত করে জানাল, হ্যাঁ।

"তা ঘড়ি কীভাবে নামাবে তার উপায় কিছু বলেছেন বাবু?"

লোকটি এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাল। অর্থাৎ না।

ছোট রায়ের ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। হুঁ, দাদাদের কাণ্ডই এই রকম। স্রেফ অর্ডার দিয়েই খালাস। বেচারা কেমন মুশকিলে পড়েছে।

তিনি লোকটিকে বললেন, "ওভাবে হবে না। একটা মই চাই। কিন্তু মইটা যে রেখেছে কোথায় কে জানে। তা যাক্‌গে, এক কাজ করো। ওই টুলটা আনো। রাখো টেবিলের ওপর।"

লোকটি সরু নড়বড়ে টুলখানা এনে টেবিলের ওপর রাখল।

"ওঠো, ওঠো, ভয় নেই।" রায় দোকানের লোকটিকে উৎসাহ দিলেন, "আমি ধরছি।"

"এজ্ঞে আপনি বাবু?" লোকটি ইতস্তত করে।

"তাতে লজ্জা কী? চড়ে পড়ো টুলে।"

ছোট রায় হাতেকলমে সমাজসেবী। এই সামান্য কাজের জন্য বাড়ির চাকরবাকরদের ডাকাডাকি করার মানে হয় না। তিনি কোঁচা সামলে শক্ত মুঠোয় টুলের পায়া চেপে ধরলেন।

ঘড়ি সমেত লোকটি মাটিতে নামল। রীতিমত ভারী ঘড়ি। দু হাত আঁকড়ে বগলদাবা করে রাখতে হয়েছে। রায় জিজ্ঞেস করলেন, "কদ্দুর যাবে?"

"এজ্ঞে ধর্মতলা।"

"যাবে কিসে?"

"ট্রেরামে।"

"আরে দূর, ট্রামে এই ঘড়ি নিয়ে উঠতেই পারবে না, যা ভিড়।"

"তবে হেঁটে যাই।"

"না না। এতখানি পথ হাঁটবে কী! বরং রিকশায় যাও। এই নাও—" রায় একখানা দু টাকার নোট লোকটির হাতে গুঁজে দিলেন, "ভাড়া।"

কৃতার্থ মুখে পেন্নাম জানিয়ে লোকটি ঘড়ি বগলে গুটগুট করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছোট রায়ও চটি ফটর-ফটর করত-করতে দোতলায় উঠলেন।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ। দোতলার বারান্দায় তিন রায়-কর্তা চেয়ারে পাশাপাশি বসেছেন, হাতে চায়ের কাপ।

বড় রায় প্রথমে কথাটা পাড়লেন।

"কানু, তুই ঘড়ির দোকানে খবর দিয়েছিস, ভেরি গুড। কিন্তু শুধু অয়েলিং আর টাইমের কথা বলেছিস কেন? বাজনাটার কথাও তো বলতে হয়। ভাগ্যিস দোকানের লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, নইলে ঘণ্টাটা আর মেরামতই হত না।"

মেজো রায় অবাক হয়ে বললেন, "আমি? আমি আবার ঘড়ির দোকানে গেলাম কখন? আমি তো ভাবলাম তুমি কিংবা বলাই খবর দিয়েছ।"

বলাই অর্থাৎ ছোট রায় সরবে বলে উঠলেন, "না না, আমি নই। আমি তো ভাবলাম তোমরা কেউ বুঝি ঘড়িটা সারাতে পাঠাচ্ছ।"

বড় রায় হতভম্বের মতো বললেন, "সেকী, লোকটা যে বলল এই বাড়ির বাবু গিয়েছিল খবর দিতে, ফর্সা লম্বা।"

চায়ের কাপ খট করে সামনের টেবিলে নামিয়ে রেখে তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন, "লোকটা চলে গেছে ঘড়ি নিয়ে?"

"হ্যাঁ, গেছে। আমি দেখেছি।" জানালেন ছোট রায়।

ধপাস্। বড় রায় ফের চেয়ার নিলেন। "দোকানের ঠিকানাটা বলেছে কি?" করুণ কণ্ঠে তিনি জানতে চাইলেন।

"উহুঁ।" হতাশ ছোট রায়ের জবাব। "ও শুধু বলল, ধর্মতলা।"

তিন কর্তাই চুপ। গম্ভীর বদন, উদাস নয়ন। তাঁরা তিন জনের কেউ নয়। ভুবনবাবু বেঁটেখাটো, শুকনো এবং কৃষ্ণকায় ব্যক্তি। এ-বাড়ির আর-কাউকে তো বাবু বলে ভুল করার কারণ নেই। তবে?

একটা বিচ্ছিরি আশঙ্কা তিনজনের মনেই চকিতে উদয় হয়। চোর নয় তো? বেটা তিন কর্তার নাকের ডগা দিয়ে ঘড়ি হাতিয়ে চম্পট দিল নাকি?

বড় রায় দু চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই ভাই। যে যার ঘরের উদ্দেশে রওনা দিলেন। চটপট পোশাক পরে বেরিয়ে পড়তে হবে। একটু পরেই আবিষ্কার হবে, ঘড়ি নেই। তারপর শুরু হবে হৈচৈ। সুতরাং আগেই সরে পড়া উচিত।

রায়বাড়ির বৈঠকখানার দেওয়াল-ঘড়ি আর কোনদিন ফিরে আসেনি। ঘড়ির রহস্যময় অন্তর্ধান নিয়ে প্রচুর জল্পনাকল্পনা খোঁজখবর হয়েছিল। কিন্তু কিছু হদিশ মেলেনি। রায়কর্তাদের কানেও অনেকে ঘড়ির কথাটা তুলেছিল। কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মোটে গা-ই করলেন না।

রাত-পোকা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তপনজ্যোতি সিংহরায়
অন্ধকারে দোরগোড়ায়
দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ দ্যাখে
একটা পোকা ফর্‌ফরায়।
কী পোকা সে? কোন পোকা?
দ্যাখ্ তো দেখি, এই খোকা—
বেগুনী, না ছাইরঙের,
শুঁড়গুলো বা কোন ঢঙের?
কী চায়? শুধু কামড়াতে?
নাকি দেয়াল ঝামরাতে?
তড়পিয়ে সে পার পাবে?
আমার হাতেই মার খাবে।
বলেই, তপন করল হাঁ—
পোকার ছানা, ঢুকে যা॥

মিষ্টির দোকান

আইসক্রীম

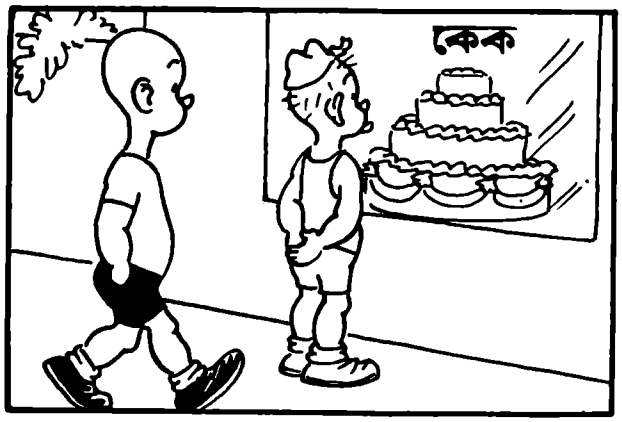
কেক

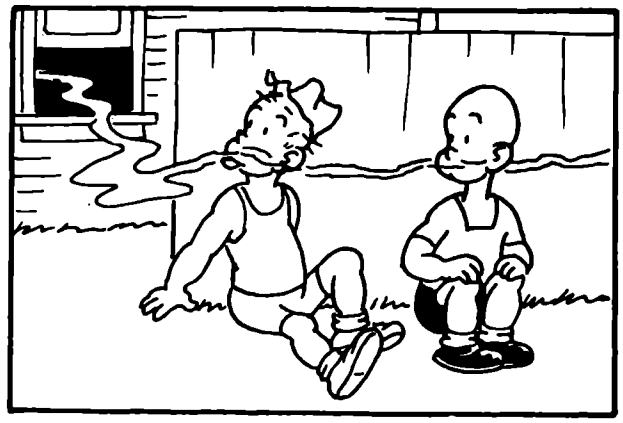

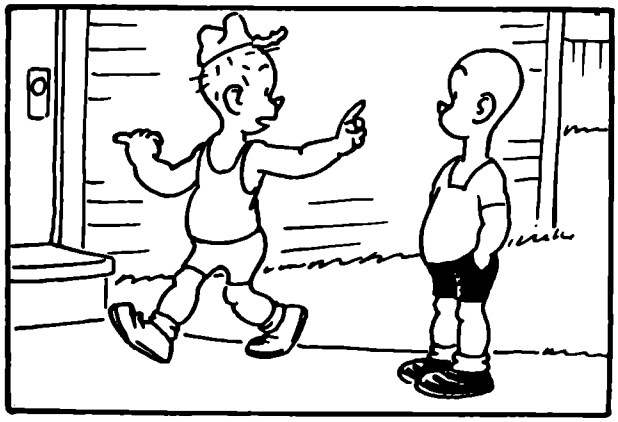

চটপট খেয়ে নে

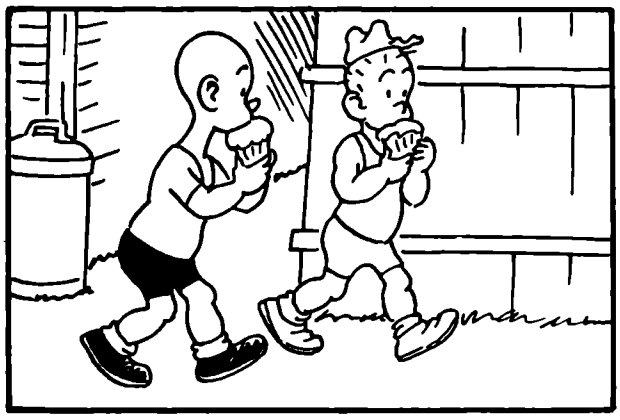

কাল তো দিদির বিয়ে, ভাঁড়ার থেকে লুকিয়ে নিয়ে এলুম।
৬-৬

ছবি এঁকেছে সোমা রায় (বয়স ১০)

বিপদের বন্ধু

পুজোর ছুটিতে বাপি ও দিদার সঙ্গে রাঁচী বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাঁচী থেকে হুড্রু ফলস্ দেখতে গিয়েছিলাম মিনি বাসে চড়ে। হুড্রু দেখতে দেখতে আমরা এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমাদের মিনি বাস আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমরা তখন ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলাম। পথ নির্জন, পথে আবার বাঘের ও ভাল্লুকের ভয় আছে শুনলাম। ওদিকে মাত্র একজন ড্রাইভার দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মিনি বাস নিয়ে। সেই ড্রাইভারের তুলনা হয় না। তিনি আমাদের রাঁচী শহরে শুধু পৌঁছেই দেননি, সারা শহর ঘুরিয়েও দেখিয়েছিলেন। আর, একটাও পয়সা নেননি এর বিনিময়ে।

—অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (বয়স ১২)।

ছবির মতো শহর

১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাস, কলকাতায় তখন হু হু করে শীতের বাতাস বইছে। আমরা ঠিক করলাম, সবাই মিলে বম্বেতে বেড়াতে যাব। বাবা টিকিট কেটে নিয়ে এলেন। ট্রেনে আমরা দু রাত থেকে পরের দিন সকালে বম্বেতে পৌঁছুলাম। রাত্তির বেলা ট্রেনে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে। মনে হয়, যেন ঘুমের মধ্যে কোথায় চলে যাচ্ছি। বম্বেতে আমার জ্যাঠামণি থাকেন, আমরা তাঁর বাড়িতেই উঠেছিলাম। ওখানে আমরা অনেক দর্শনীয় জিনিস দেখলাম। বম্বেতে কিছুদিন থেকে আমরা গোয়ায় গেলাম, জাহাজে করে গোয়া যাত্রাটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সারা রাত জাহাজের ডেকের উপর আমরা শুয়ে রইলাম। পরের দিন সকাল বেলা আমরা গোয়ায় পৌঁছলাম। ওখানকার একটা হোটেলে আমরা ছিলাম।

গোয়া খুব সুন্দর শহর। একেবারে ছবির মতন সাজানো। পরপর দুদিন আমরা টুরিস্ট বাসে করে গোয়ার বিখ্যাত জায়গাগুলো দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে অনেক কাজুবাদামের গাছ আছে। আমরা অনেক কাজুবাদাম খেলাম। গোয়ায় পর্তুগীজ আমলের অনেক সুন্দর সুন্দর গীর্জা আছে। সেগুলো দেখে বিখ্যাত মার্মাগাঁও বন্দর দেখলাম। আর দেখলাম, সেন্ট জেভিয়ারের কবর।

চার পাঁচ দিন গোয়ায় থাকার পরে আমরা বাসে করে বম্বে ফিরলাম। বিকেল পাঁচটায় বাসে উঠলাম। সারা রাত পাহাড়ের কোল দিয়ে বাস চলল। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের ওপরের গাছগুলো দেখতে আমার খুব ভাল লাগছিল। পরের দিন সকালে আমরা বম্বে পৌঁছলাম। আমার স্কুল খোলার সময় হয়ে এসেছিল, তাই বম্বেতে কিছুদিন থেকে আমরা আবার কলকাতায় ফিরে এলাম।

—সুপর্ণা মিত্র (বয়স ১০)।

চিঠি

আমি মাসিক আনন্দমেলার একজন গ্রাহক। এই পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই আমার মন জয় করে ফেলেছে। এই পত্রিকার 'লেখাপড়া' বিভাগটি আমার পড়াশুনায় অনেক সাহায্য করেছে। যে কোন ছোটদের পত্রিকার তুলনায় এই পত্রিকাটি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। আমি চাই, অবিলম্বে এই পত্রিকাটিকে পাক্ষিক করা হোক।

—সুমিত আঢ্য, বয়স (১২)।

বাঘা

আমার একটি কুকুর আছে। কুকুরটির নাম বাঘা। বাঘা খুব দুষ্টু। এমনি বিস্কুট দিলে সে খাবে না, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তবে খাবে। রাত্রে সে ঘুমোয় না, বাড়ির দরজায় পাহারা দেয়। বাঘা খুব সুন্দর খেলা করতে পারে।

—পার্থসারথি ঘোষ, (বয়স ১৪)।

টনি গ্রেগ

টনি গ্রেগ
খায় এগ

কল্পন ঘোষ, (বয়স ৪)

দুই বোন

আমার নাম রিনি,
আমি খাই চিনি।
আমার বোন নুপুর,
ঘুমায় সারা দুপুর।

রিনি ঘোষ (বয়স ৬)

ভোম্বল

তার নাম ভোম্বল
গায়ে দেয় কম্বল
খায় শুধু অম্বল
চলে গেল চম্বল।

—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

চোর

এক যে ছিল চোর,
তার গায়েতে খুব জোর।
সে খায় গুড়ি-গুড়ি,
সে খায় গুড়-মুড়ি।
চোর এল ছুটে,
নিল সব লুটে।

—শুভাগত বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে শিলাদিত্য পাল (বয়স ১০)

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম

বিমল কর

চাকরি থেকে রিটায়ার করলে মানুষ কেমন হাঁসফাঁস করে প্রথম দিকটায়। কারও শরীর ভেঙে যায়, কারও ব্লাডপ্রেসার চাগায়, কেউ বা সারাদিন বড়-বড় ঢেঁকুর তোলে, কাউকে আবার দেখেছি রাত্রে শোবার আগে কবিরাজী তেল মেখে ঘুমের সাধ্যসাধনা করে। প্রথম ধাক্কাটা সামলানো খুবই মুশকিল, সব কেমন ওলট পালট হয়ে যায় বলেই বোধ হয়। এক-একজন এই বিশ্রী অবস্থাটা কাটাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে কাশী-হরিদ্বার-বৃন্দাবন ঘুরতে ; কেউ বা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কারও বা নেশা ধরে তাস-পাশায়। গাছপালা-বাগান-কুকুর-বেড়াল, এসব নিয়েও কেউ কেউ মেতে ওঠে। গোড়ার ধাক্কাটা একবার সামলে নিতে পারলেই হল, তারপর ধীরে-ধীরে সব সয়ে যায়।

আমাদের মহাদেব জ্যাঠামশাইকেই প্রথম দেখলাম, যেদিন চাকরি থেকে মুক্তি পেলেন, তার পরের দিন থেকেই আহ্লাদে আটখানা। ধানবাদে আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। বাবার বন্ধুর মতন। বয়েসে সামান্য বড় বলে বাবা তাঁকে দাদা বলতেন। আমরা বলতুম, জ্যাঠামশাই। বেঁটে-খাটো মানুষ, গোলগাল চেহারা, গায়ের রঙ ফরসা। মাথার মাঝমধ্যিখানে সিঁথি করে চুল আঁচড়াতেন। সাবেকী গোঁফ ছিল তাঁর। মাথার চুল, গোঁফ দশ আনাই সাদা হয়ে গিয়েছিল জ্যাঠামশাইয়ের।

আমরা থাকতাম ভাড়া-বাড়িতে। জ্যাঠামশাইদের বাড়িটা ছিল নিজেদের। পুরনো বাড়ি। দোতলা। সংসারে মানুষ বলতে ছিলেন জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, আর ঠাকুমা। মাঝে-মাঝে দুমকা থেকে রাধাদি আসত বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে।

জ্যাঠামশাই আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমাকে একটু বেশী। আমার বাবাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন মনে করতেন।

এই জ্যাঠামশাইকে দেখলাম, চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তুড়ি মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না গেলেন তীর্থধর্ম করতে, না

বললেন তাস-পাশার আড্ডায়। তাঁর শরীর ভাঙল না, রোগটোগ কাছে ঘেঁষল না, যেমন-কে-তেমন চেহারা নিয়ে জ্যাঠামশাই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বাবা বললেন, "মহাদেবদার ধাতই আলাদা। ও-মানুষ কি সহজে ভাঙেন!"

জ্যাঠামশাই যে ভাঙার পাত্র নন, সেটা আমরাও জানতাম।

একদিন কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল।

জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে গল্পটল্প করে চলে যাবার পর বাবা হাঁক দিয়ে মাকে বললেন, "শুনেছ, মহাদেবদা আশ্রম খুলবেন।"

আশ্রমের কথা শুনে মা যেন খুশীই হলেন। বললেন, "ভালই হল। আমাদের এদিকে আশ্রমটাশ্রম নেই, ওই এক শিবমন্দির। আশ্রম খুললে তবু দু দণ্ড গিয়ে বসতে পারব। ঠাকুরের গানটান হবে।"

বাবা বললেন, "সে গুড়ে বালি। মহাদেবদা চিত্তশুদ্ধি আশ্রম খুলবেন।"

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা কী? চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটা আবার কেমন জিনিস?"

"বুঝলাম না," বাবা মাথা নেড়ে বললেন, "ভেঙে কিছু বললেন না; তবে তোমার ঠাকুরদেবতার জায়গা বোধ হয় ওই আশ্রমে হবে না। দেখো কী হয়।"

আমরা ছেলেমানুষ। বড়দের কথায় কথা বলতে নেই। কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বলাইদের পাড়ায় একটা আশ্রম আছে; সেখানে মাঝে মাঝে উৎসব হয়। উৎসবের দিন আশ্রমে গেলেই ভিজে ছোলা, গুড়, বাতাসা, কলা, দু-এক টুকরো বাতাবি লেবু, চিনির মণ্ডা পাওয়া যায়। জ্যাঠামশাই ওই রকম একটা আশ্রম খুললে মন্দ হত না। মাঝে-মাঝে কিছু পাওয়া যেত।

জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রম সম্পর্কে তেমন কোনো কৌতূহল আমাদের তখন আর জাগল না।

এর কয়েকদিন পরে দেখলাম, জ্যাঠামশাইদের বাড়ির নীচের তলা সাফসুফ হচ্ছে। তারপর এল বালি, সুরকি, দু-চার গাড়ি ইট। মিস্ত্রী মজুর খাটতে লাগল। নীচের তলার ব্যবস্থা বেশ পালটে ফেললেন জ্যাঠামশাই। গোটা দুই ঘর হল; উঠোনে জলকলের ব্যবস্থা করলেন; ভেতর বাড়ি আর বাইরের বাড়ির মধ্যে একটা পাঁচিল গাঁথা হল। চুনকাম-টুনকামও হয়ে গেল একদিন।

এরপর দেখি দড়ির খাটিয়া এল গোটা ছয়েক। ধুনুরী ডেকে পাতলা-পাতলা তোশক-বালিশ বানানো হল। শেষে একটা ছোট সাইনবোর্ডও লাগানো হল বাড়ির বাইরের দিকে। তাতে লেখা থাকল : চিত্তশুদ্ধি আশ্রম।

বাবা বললেন, "মহাদেবদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুনছি উনি নাকি যত চোর-বাটপাড়-পাগল এনে ওই আশ্রমে রাখবেন। বাড়ির মধ্যে একী কাণ্ড! বউদি চেঁচামেচি করছেন, মাসিমা কাঁদছেন। কী পাগলামি বল তো!"

আমরা ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম; একটা অদ্ভুত কিছু হতে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাই যেমন-তেমন মানুষ নন, নিশ্চয়

অনেক ভেবেচিন্তে কাজে নেমেছেন। লোকে তাঁকে পাগল বলুক আর যাই বলুক, তিনি যা ঠিক করেছেন তা থেকে নড়বেন না।

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম সম্পর্কে আমাদের রীতিমত কৌতূহল জাগল। পাড়ার লোকজনও দেখলাম জ্যাঠামশাইদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে সাইন-বোর্ডটা, হাসাহাসি করছে। কেউ বলছে, দত্তমশাই উন্মাদ হয়ে গেছেন; কেউ বা রসিকতা করে বলছে, দত্তবাবু নিশ্চয় হোটেল খুলবেন।

যার যা খুশি বলুক, আমরা তিন ভাইবোন কিন্তু জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে দুবেলা আসা-যাওয়া করতে লাগলুম। জ্যাঠাইমার মুখ গম্ভীর; ঠাকুমা চুপচাপ। জ্যাঠামশাই আগের মতনই হাসিখুশী। নীচের ঘরে তিনি একটা টেবিল পেতেছেন, টেবিলের ওপর রুলটানা খাতা, দোয়াত, কলম, লাল নীল পেনসিল, একটা মোটাসোটা রুল আর দু-একটা বই রেখে অফিস-ঘর সাজিয়েছেন।

আমরা রোজই ঘুরঘুর করি ও-বাড়িতে। একদিন জ্যাঠামশাই আমাদের ডাকলেন। ডেকে নীচে অফিসঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমি, কালু আর লতু বেঞ্চিতে বসলাম।

জ্যাঠামশাই বললেন, "তোরা নীচের ঘরটর সব দেখেছিস ভাল করে?"

তিনজনেই মাথা নাড়লাম। দেখেছি।

জ্যাঠামশাই বললেন, "কাল দুপুর থেকে আমার আশ্রমে লোক আসতে শুরু করবে। বগলাকে চিনিস?"

আমাদের এদিকে তিনজন বগলা আছে। একজন বাড়ি-বাড়ি কলের জল দেয় খাবার জন্যে; একজন পোস্টাফিসের পিয়ন; আর একজন থাকে বাজারে। আমি বললাম, "কোন বগলা?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "বাজারের বগলা।"

বাজারের বগলার বড় দুর্নাম। সে ফলমূল বেচে। তার দোকান নেই। রাস্তায় বসে শসা, কলা, শুকনো কমলালেবু, শাঁক-আলু এইসব বিক্রি করে। গরিব লোক। অল্পস্বল্প যা জোগাড় করতে পারে তাই বেচে দিন চালায়। লোকটা ভীষণ মানুষ ঠকায়। ছেলেমানুষ দেখলে তো কথাই নেই, ফিরতি পয়সাও কম দেবে। অচল পয়সাও চালিয়ে দেয়।

বগলার নাম শুনে আমি আঁতকে উঠে বললাম, "বগলা তো চোর, জ্যাঠামশাই।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "চোর নয়, লোভী। দু পয়সার জিনিস বেচে পাঁচ পয়সা পকেটে ভরতে চায়। আমি ওকে শুধরে দেব। ওর চিত্তশুদ্ধি দরকার।"

কালু বলল, "বাজারে গণেশ আছে; সে আরও চোর।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "আমি সব লিস্ট করে ফেলেছি। ঘুরে ঘুরে, দেখে দেখে দশজনের লিস্টি করেছি। বগলাকেই প্রথম আনব। বগলার পরে আনব পণ্ডাকে।"

পণ্ডার নামে লতু সিঁটিয়ে গেল। বলল, "ও জ্যাঠামণি, পণ্ডা ভীষণ পাজী। ওর একটা পোষা নেউল আছে। আমাদের স্কুল যাবার সময় ভয় দেখায়।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "পণ্ডার মাথায় ছিট আছে খানিকটা। একসময়ে স্টেশনে মুসাফিরখানায় পড়ে থাকত। মালপত্তরও সরাত। পুলিসের হাতে শিক্ষা পেয়ে শুধরেছে অনেকটা। তবু পুরনো অভ্যেস পুরোপুরি যায়নি। ওরও চিত্তশুদ্ধি দরকার।"

আমরা তিন ভাইবোনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে এলাম। কিছু তো আর বলতে পারি না জ্যাঠামশাইকে।

বাইরে এসে কালু বলল, "চিত্তশুদ্ধি কেমন করে হয়?"

আমরা কিছুই জানতাম না। চুপ করে থাকলাম।

পরের দিন থেকে জ্যাঠামশাইয়ের চিত্তশুদ্ধি আশ্রম চালু হয়ে গেল। সত্যি-সত্যি বগলা এসে আশ্রমে ঢুকল। একটা ছেঁড়া গামছা, মাথায় ফলের ছোট ঝুড়ি, ডান হাতে এক পুঁটলি—বগলা বেশ হাসতে হাসতে আশ্রমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

বিকেলে একবার তাকে দেখতে গেলাম। গরম কাল। কার্বোলিক সাবান মাখিয়ে জ্যাঠামশাই তাকে স্নান করিয়েছেন, নতুন একটা ধুতি আর গেঞ্জি দিয়েছেন পরতে। বগলা স্নান করে, ধুতি-গেঞ্জি পরে বিড়ি টানছিল। আমাদের দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

জ্যাঠামশাইয়ের চিত্তশুদ্ধি আশ্রমে জন্ম চারেক লোক সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে জুটে গেল। বগলা, হাবুল, গিরিধারী আর কেষ্ট। একজন ঠগ, অন্যরা ছিঁচকে চোর, পাগল। পণ্ডাকে জ্যাঠামশাই ধরতে পারেননি তখনও।

আমাদের বাড়িতে, পাড়ায় ততদিনে একটা হৈ-হৈ পড়ে গেছে। চোর, ছ্যাঁচড়, পাগল এনে-এনে জ্যাঠামশাই বাড়িতে পুরছেন, তারা দিব্যি বিনি পয়সায় দুবেলা ডাল-ভাত-তরকারি খাচ্ছে, দড়ির খাটিয়ায় তোশক পেতে ঘুম মারছে, এরপর তো এরাই পাড়ার বাড়িতে-বাড়িতে চুরি-চামারি করতে বেরুবে।

কেউ বলছে, পাড়ার মধ্যে এসব চলতে দেওয়া যায় না; কারও-কারও মত হল, থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে এলে ভাল হয়। বুড়োর দলই বেশী হই-হই করতে লাগল—চুরি-চামারির ভয় ছাড়াও পাড়ার একটা ইজ্জত রয়েছে, জ্যাঠামশাই সেই ইজ্জত নষ্ট করে ছাড়লেন।

দু-পাঁচজন জ্যাঠামশাইকে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, নিষেধও করলেন। জ্যাঠামশাই কোনো পাত্তাই দিলেন না। বললেন, "তোমরা আমার চরকায় তেল দিতে এস না। আমার বাড়িতে আমি যা খুশি করব, কারও কিছু বলার এক্তিয়ার নেই।"

পাড়ার লোক জ্যাঠামশাইয়ের ওপর চটতে লাগল। বাড়িতে জ্যাঠাইমাও রাগে গরগর করতেন। ঠাকুমা অবশ্য হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতেও দেখতাম, বাবা বেশ অসন্তুষ্ট। বলতেন, "মহাদেবদার মাথা খারাপ হয়েছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে কতকগুলো রাস্তার চোর-জোচ্চরকে পুষছেন। পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করে না।"

চিত্তশুদ্ধি আশ্রম মাসখানেকের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। চারের জায়গায় ছয় হয়ে গেল আশ্রমের সদস্য। নতুন দুজন এল স্টেশনের ওপার থেকে। একজনের নাম ঝন্টু, অন্যজনের নাম মিশির। আরও দু-একজন নাকি খাতায় নাম লিখিয়ে গেল, পরে আসবে।

আমি আর কালু জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রমের ব্যাপার-স্যাপারগুলো দেখতে যেতাম। সকালে বগলারা ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করত, মুখ ধুয়ে উঠোনে গিয়ে বসত আসন করে, জ্যাঠামশাই নীচে নেমে আসতেন। জ্যাঠামশাইয়ের সামনে হাত জোড় করে বসে ওরা একটা বিদঘুটে শ্লোক আওড়াত। জ্যাঠামশাই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের মুখের কথা কিছু বোঝা যেত না। গলার স্বরও অদ্ভুত।

এরপর থাকত বগলাদের ছোলা-মুড়ি-গুড়ের ব্যবস্থা। খেয়ে নিয়ে ওরা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে অফিসঘরে এসে দাঁড়াত। বগলাকে জ্যাঠামশাই টাকা দিতেন, কোনোদিন পাঁচ, কোনোদিন সাত। বগলা চলে যেত বাজারে। ফল কিনে বেচাকেনা করে আবার বেলায় ফিরে আসবে। চুরিচামারি করবে না। লোক ঠকাবে না। ফিরে এসে হিসেব দিতে হবে জ্যাঠামশাইকে। বগলার পর টাকা নিত গিরিধারী। সে যাবে তিলকুট, রেওড়ি, তিলের নাড়ু বেচতে। বগলার মতন তাকেও ফিরে এসে হিসেবপত্র দিতে হবে।

হাবুল আর কেষ্টর মধ্যে পালা করে একজন যেত জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাজারে, অন্যজন আশ্রমের ঘরদোর পরিষ্কার করত, পাঁড়ে ঠাকুর রান্না করতে এলে জলটল তুলে দিত। আশ্রমের রান্না হত নীচেই।

সন্ধের দিকে জ্যাঠামশাই তাঁর আশ্রমের লোকদের ধর্মকথা শোনাতেন, সৎ শিক্ষা দিতেন, মন্দ কাজ করলে মানুষের কী হয় তার ফিরিস্তি শোনাতেন।

মোটামুটি এইভাবেই চিত্তশুদ্ধি আশ্রম চলছিল। আশ্রমের লোকেরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই চেহারা পালটে ফেলতে লাগল। সাজপোশাক সকলের একরকম ছিল না। কেউ-কেউ ধুতি পেয়েছিল, গেঞ্জি পেয়েছিল; কাউকে কাউকে জ্যাঠামশাই খাকি হাফ প্যান্ট আর ফতুয়া দিয়েছিলেন। আমরা অবশ্য আশ্রমে গেলেই কার্বোলিক সাবানের গন্ধ পেতুম, কখনো দেখেছি—পাঁচড়ার মলম, নিমতেলের গন্ধ ছাড়ছে বাতাসে। কেষ্ট পাগলা মাঝে মাঝে পালিয়ে যেত আশ্রম ছেড়ে, জ্যাঠামশাই তাকে ধরে আনতে সারা শহর ঘুরে বেড়াতেন। আনতেনও ধরে।

কার কতটা চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে জানবার আগেই একদিন শুনলাম বগলা পালিয়েছে। শহর ছেড়েই উধাও। হাবুল বলল, "বাবুর কাছে পাঁচ টাকা নিলে ও চার টাকার ফল কিনত. এক টাকা আগেই মারত। চার টাকার ফল বেচে বাবুর কাছে সাড়ে পাঁচ টাকার হিসেব দিত। আট আনা তার নামে জমত লাভ বাবদ।"

জ্যাঠামশাই কোনো কথা বললেন না। গম্ভীর হয়ে থাকলেন। বগলার জায়গায় এল অনাদি। বয়েস কম, চালাক চতুর। সুশীল কাকাদের বাড়িতে কাজ করত। নিজেই এসে জ্যাঠামশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরল। তার বড় হাতটানের অভ্যেস। লোভ দমন করতে পারে না। তার চিত্তশুদ্ধি দরকার।

আশ্রমে অনাদির জায়গা হয়ে গেল।

বগলা পালাবার সপ্তাহখানেক পরে গিরিধারীও পালাল। অবশ্য শহর ছেড়ে চলে গেল না। ঘাপটি মেরে থাকল। আশ্রম তার পোষাচ্ছে না।

পাগলা কেষ্ট একদিন খেপে গিয়ে হাবুলের সঙ্গে এমন মারপিট করল যে, কেষ্টর কনুইয়ের জোড়টাই গেল ভেঙে। তাকে রেলের হাসপাতালে রেখে আসতে হল জ্যাঠামশাইকে, তার চিৎকার আর সহ্য হচ্ছিল না জ্যাঠাইমার।

আশ্রমে আসবে বলে যারা নাম দিয়েছিল, আগেই জ্যাঠামশাই তাদের খুঁজতে লাগলেন। কেউ আর এখন আসতে চায় না। খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া সব ফ্রি। তবু কেন যে ওরা আসতে চাইছে না, জ্যাঠামশাই বুঝতে পারলেন না।

আমাকে বললেন, "হ্যাঁরে, কী হল বল তো? ব্যাটারা নিজেরাই বলেছিল আসব, এখন আমায় দেখলেই পালায়।"

আমি বললাম, "ভয়ে।"

"ভয়ে? কিসের ভয়ে?"

"তা জানি না। এখানে এলেই নাকি দাগী হয়ে যেতে হয়।"

"দাগী?"

"তাই তো বলছিল একদিন গিরিধারী। বলছিল, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলে যেমন দাগী চোর হয়ে যেতে হয়, এখানে থাকলেও সেই রকম হয়।"

জ্যাঠামশাই একটু ভেবেচিন্তে বললেন, "বুঝেছি। আমার পেছনে এনিমি লেগেছে।"

এর দিন দশেক পরে একদিন সকালবেলায় জ্যাঠামশাই হন্তদন্ত হয়ে বাবার কাছে এসে বললেন, "সত্য, আমার গালে ওই ছোঁড়াটা চড় মেরে পালিয়েছে।"

বাবা বললেন, "সে কী! কোন ছোঁড়া চড় মারল?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "ওই যে অনাদি। সুশীল মিত্তিরদের বাড়ি থেকে এসেছিল। ছোঁড়াটা নিজেই এসেছিল। তার কথা-বার্তা হাবভাব আমার ভাল লেগেছিল। দিন কয়েক দেখেশুনে তাকে আমি বাড়ির কাজে লাগিয়েছিলাম। তোমার বউদিও দেখতাম ছোঁড়াকে পছন্দ করছে। তখন কি জানতাম ছোঁড়ার পেটে-পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি!"

"কী করেছে ছোঁড়াটা?" বাবা আসল কথাটা জানতে চাইলেন।

জ্যাঠামশাই বললেন, "আজ সকালে উঠে বাজার যাব; দেখি আমার পকেট-ঘড়িটা নেই। ও কি আজকের ঘড়ি। আমার বাবা-মশাই দিল্লি দরবারের সময় কিনেছিলেন। সোনা রয়েছে ওতে। দামের কথা বাদ দাও, ওটা আমার বাবার স্মৃতি। ছোঁড়াটাকে আমি এত বিশ্বাস করলাম, আর ও কিনা আমার ঘড়ি চুরি করে পালাল।"

বাবা বললেন, "থানায় গিয়ে খবর দিন। আর তো কিছু করার নেই।"

জ্যাঠামশাই হায়-হায় করতে করতে চলে গেলেন।

এর দিনতিনেক পরে আবার যে ঘটনাটি ঘটল সেটা আরও অদ্ভুত।

জ্যাঠামশাই রাত্রের দিকে আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে তাঁর চুরি-যাওয়া ঘড়িটা দেখালেন। ঘড়ি ফেরত পেয়ে জ্যাঠা-মশাইয়ের যতটা খুশী হওয়া উচিত ছিল, অতটা খুশী তাঁকে দেখাচ্ছিল না।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, "কেমন করে পেলেন ঘড়িটা?"

জ্যাঠামশাই পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে বাবার হাতে দিলেন। বললেন, "সুশীল আমায় খুব একটা শিক্ষা দিয়েছে।"

চিরকুটটা পড়ে বাবা হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, "সুশীলবাবুই তাহলে তাঁর বাড়ির চাকর অনাদিকে আপনার আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন ঘড়ি চুরি করতে।"

জ্যাঠামশাই চুপ করে থাকলেন।

বাবার হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে জ্যাঠামশাই দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন বাইরে। তুলে দেখি, সুশীলকাকা বড় বড় করে লিখেছেন ঃ "ঘড়িটা ফেরত নেবেন। আমাকে ক্ষমা করবেন। অনাদি চোর নয়। আমার কথায় চুরি করেছিল। আপনার চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটি রাখবেন না তুলে দেবেন ভেবে দেখবেন।"

জ্যাঠামশাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সাধের চিত্তশুদ্ধি আশ্রমটি তুলেই দিলেন।

কলকাতার বই মেলায় ছোটদের বই

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পেলে তোমাদের সব্বার চেনা লোক। যদি শোনো, পেলে কলকাতায় আসছেন তাহলে তাঁর খেলা দেখতে অনেকেই তোমরা ময়দানে দিন তিনেক নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে লাইন দেবে। এ হেন পেলের ছোটভাই বলে নিজের পরিচয় দিতে কার না ভাল লাগে বল? উঃ, যদি সত্যিই তোমাদের মধ্যে কেউ কোনোদিন বলতে পারতে, "আরে পেলেকে আর দেখিনি, সে তো আমার নিজের বড়দা!" না, এমন কথা টেনিদা পর্যন্ত বলতে সাহস করেনি।

কলকাতার বইমেলায় এই পেলেরই ছোটভাইয়ের সঙ্গে

পশ্চিম জার্মানির বইয়ের স্টলে

আমার আচমকা দেখা হয়ে গেল। একটা রঙিন বইয়ের মলাটে তার ছবি—ফেডারাল রিপাবলিক অব জারমানির স্টলে ঢুকলে প্রথমেই দেখতে পাবে, ঘরের বাঁ ধারের কোণ থেকে সরাসরি সে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মাথার ওপর লেখা : পেলে সাইন ব্রুডার, অর্থাৎ পেলের ভাই বা ব্রাদার। তোমরা তো জানো, পেলে কালো মানুষ। পেলের এই খুদে ভাইটি কিন্তু জাতে জার্মান, দেখতে টুকটুকে আপেলের মতো, আর বয়েস খুব জোর সাত কি আট। পেলেকে সে অবশ্য তোমাদেরই মতো কোনোদিন দেখেনি। কিন্তু তার খুব ইচ্ছে যে, একদিন সে বড় হয়ে ঐ কালো মানুষটার মতো পৃথিবী কাঁপিয়ে ফুটবল খেলবে। এবং নিজেকে সে পেলের ছোটভাই বলে ভাবতে খুব ভালবাসে।

প্রথম প্রথম সে কিন্তু নিজেকে স্বয়ং পেলে বলেই ভাবত। স্কুলের বন্ধুদেরও সে বলে দিয়েছিল, তারা যেন তাকে পেলে বলেই ডাকে। কিন্তু আপত্তি জানাল তার এক বন্ধু যে নিজেকে জারমানির সবচেয়ে নামজাদা ফুটবল প্লেয়ার উভে বলে ভাবে। উভে বলল, "তা কী করে হবে, পেলের মতো প্লেয়ার কখনো

তন্ময় হয়ে জীবজন্তুর বই পড়ছে

দুবার জন্মায় না, সুতরাং পেলে হওয়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।" অগত্যা এই ছোট্ট ছেলেটিকে পেলের ছোটভাই হিসেবেই খুশি থাকতে হল। এই মজার গল্পটি যিনি লিখেছেন তাঁর নাম স্টাইনার। বইমেলায় জার্মান ভাষায় লেখা ছোটদের জন্যে আরও অনেক মজার-মজার বই দেখলাম। কোনো বইটির নাম গানের বাগান, আর কোনোটির নাম একটি ডাকাতে জন্তু। জার্মান ভাষা না জানলে এসব বইয়ের এক লাইনও পড়া যাবে না। কিন্তু পাতায়-পাতায় এমন সব ছবি যে পড়তে না পারার দুঃখটা সবসময় মনে থাকে না।

অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস-এর স্টলে একেবারে সামনেই

যত বই, তত মজা

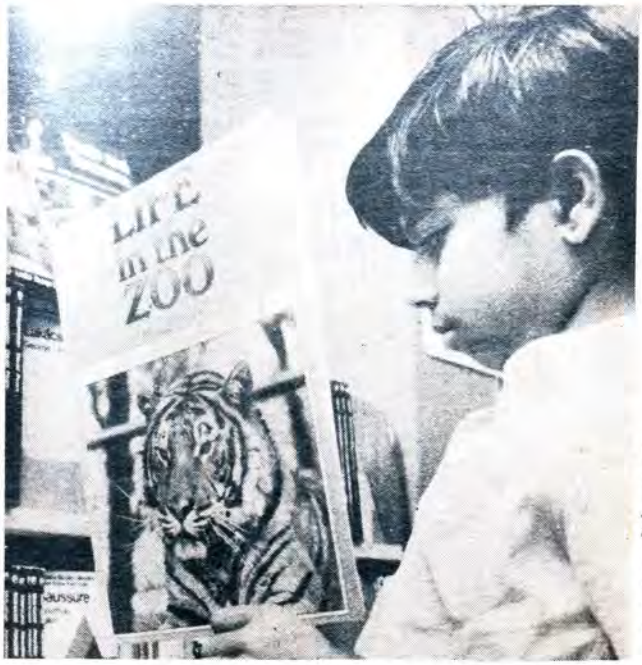

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা মলাট দূর থেকে দেখেই চিনতে পারা গেল। কাছে গিয়ে দেখলাম প্রোফেসর শঙ্কু, ফেলুদা আর ফটিকচাঁদ গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে আনন্দ পাবলিশারস-এর

এর আগ্রহ চিড়িয়াখানায়

আনন্দ পাবলিশার্সের স্টলে

তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল সবার প্রিয় টিনটিন। চাঁদে যাওয়া থেকে মরুভূমি ভ্রমণ পর্যন্ত টিনটিন-এর সবকটা বই দেখলাম সারি দিয়ে সাজানো। ছোটদের ভিড় সবচেয়ে বেশি সেখানে। এছাড়া রবিন হুড থেকে এনিড ব্লাইটন-এর ট্রেজার হানটারস পর্যন্ত সবকিছু তোমাদের জন্যে রঙিন মলাটে সেজে-গুজে ছড়িয়ে ছিল। যারা ডাকটিকিট জমাও তাদের জন্যে ছিল 'স্ট্যাম্পস' নামের এমন একটি রঙিন বই যেখানে আছে পৃথিবীর সব দেশের ডাকটিকিটের ছবি আর খবর!

তোমাদের মধ্যে যাদের অঙ্কের নামে গায়ে জ্বর আসে তাদের জন্যে আমেরিকান বইয়ের একটি স্টলে এমন সব অঙ্কের

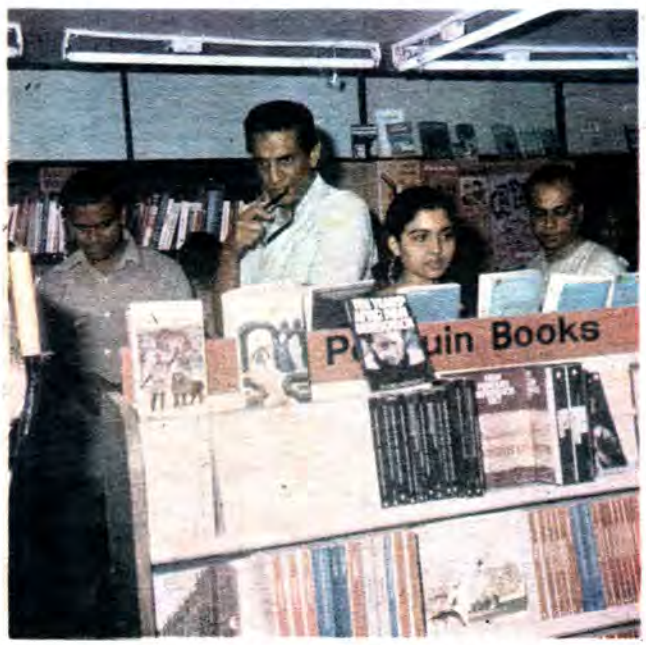

বই-মেলায় সত্যজিৎ রায়

বই দেখলাম যাতে মনে হল অঙ্ক কষাটা খুব একটা মজার খেলা। আমাদের দেশের অঙ্কের বইগুলোর চেহারা দেখলেই মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে, গলা শুকিয়ে যায়। কিন্তু ছোটদের জন্যে লেখা এসব অঙ্কের বইয়ে ছবি আর খেলার মধ্যে দিয়ে অঙ্ক শেখানো হয়েছে। একটা অঙ্কের বইয়ের মলাটে দেখলাম ব্যাট, বল আর উইকেট-এর ছবি। অঙ্কের বইগুলো যেখানে রাখা ছিল ঠিক তারই ওপরে মনটাকে আরও খুশি করার জন্যে রঙিন টি ভি'রও ব্যবস্থা ছিল। মনীষার স্টলে ছোটদের জন্যে চোখ-ধাঁধানো রাশিয়ান বই দেখলাম অনেক। যারা বাঁড়তে রঙিন মাছ রাখ তাদের জন্যে আছে দ্য কালারড ফিনস বলে আর্ট পেপারে ছাপা ঝকঝকে একটা বই যার প্রতি পাতায় হরেক রকম মাছের ছবি আর তাদের সম্বন্ধে নানান খবর। দাম কত জান বইটার? মাত্র দেড় টাকা।

স্টলে। বাদশাহী আংটি, এক ডজন গপ্পো, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, সোনার কেল্লা, আর জয় বাবা ফেলুনাথ, কী নেই বল? এছাড়াও দেখা হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সত্যিকার রাজপুত্রের সঙ্গে, মতি নন্দীর নট আউট ননীদাকেও দেখলাম ঠিক বিমল করের ওআন্ডার মামার পাশেই। পূর্ণেন্দু পত্রীর ছড়ায় মোড়া কলকাতায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এরা দুজনেই। পিছনে ছায়া ফেলে খাড়া ছিল লীলা মজুমদারের বাতাসবাড়ি।

আর তোমাদের মধ্যে যারা ছোটদের বই ডিঙিয়ে আরও অনেক-অনেক জিনিস জানবার জন্যে বড়দের বইয়ের দিকে মাঝে-মধ্যে হাত বাড়াও তাদের খুব ভাল লাগত রূপার স্টলটি দেখতে। তোমাদের মধ্যে যারা কবিতা লেখ কিংবা কবিতা পড়তে ভালবাস তাদের ভাল লাগত কবিদের জীবনী নিয়ে একটি বই, যার প্রচ্ছদে রয়েছে ইংরেজ কবি শেলীর একটি সুন্দর রঙিন ছবি। এরই কিছু দূরে দেখলাম একটা মজার বই। নাম: দ্য ফেমাস ফেসেস অফ দ্য ওয়ারল্ড। প্রতি পাতায় পৃথিবীর বিখ্যাত সব মানুষদের রঙিন ছবি। এ বই কার না ভাল লাগবে?

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম-এর উল্টো দিকের মাঠে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত যে বইমেলা হয়ে গেল সেখানে প্রতিদিনই কিছু না কিছু মজার ঘটনা ঘটেছে। ১ মার্চ-এর ঝাঁঝাঁ দুপুরে সত্যজিৎ রায় এলেন বই দেখতে। কাঠফাটা রোদ্দুরে সব্বাইকার বেশ গরম লাগছিল। সত্যজিৎ রায় দরদর করে ঘামছিলেন আর মুখ মুছছিলেন। একদল স্কুলের ছেলে তাঁকে ঘিরে ধরেছিল অটোগ্রাফ-এর জন্যে। এমন সময় সেই দুর্ধর্ষ দুপুরবেলা মাইকে সমস্ত মেলা সরগরম করে বেজে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান, "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।" সত্যজিৎ গম্ভীরভাবে একবার আকাশের দিকে তাকালেন।

শব্দ-সন্ধান

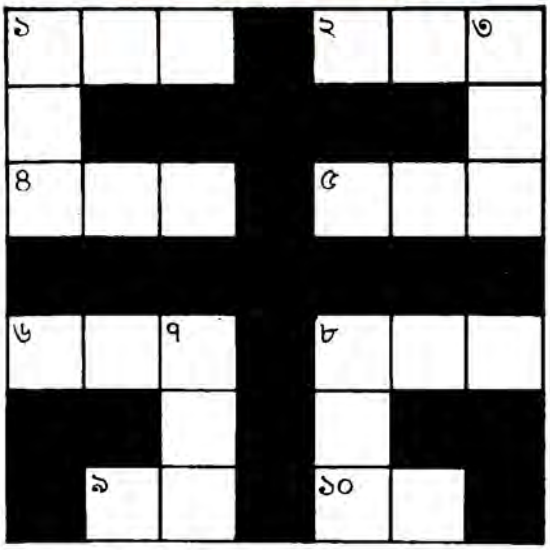

এবারের শব্দ-সন্ধানের নাম দিচ্ছি 'ফুলেল' শব্দ-সন্ধান। সংকেতমাফিক ঘরগুলো পূরণ করতে হবে—সবই ফুলের নাম দিয়ে।

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যে-ফুলের নাম রবীন্দ্রনাথের একখানা নাটকের নামের ভিতরে আছে। (২) যে-ফুলের কলির সংগে সুন্দর আঙুলের তুলনা করা হয়। (৪) বর্ষাকালে গন্ধে মাতোয়ারা করে। (৫) বড় গাছ তার ছোট ফুলের চাদর তলায় বিছিয়ে রাখে। **(৬)** ফুলের রানী। (৮) গাছের পাতা তেতো, ফুলের গন্ধ মিষ্টি। (৯) শরতে এই ফুল মাঠের শোভা। (১০) উলটে নাও, ভালো নাম তো চার নম্বরেই পেয়ে গেছ।

উপর-নীচ : (১) পদক্ষেপ আর ফুল—দুই-ই বোঝায়। (৩) পদ্ম। (৭) সরস্বতী তুষ্ট হন এই ফুলে। (৮) তুলোও হয়, ফুলও হয়।

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

গতবারের সমাধান

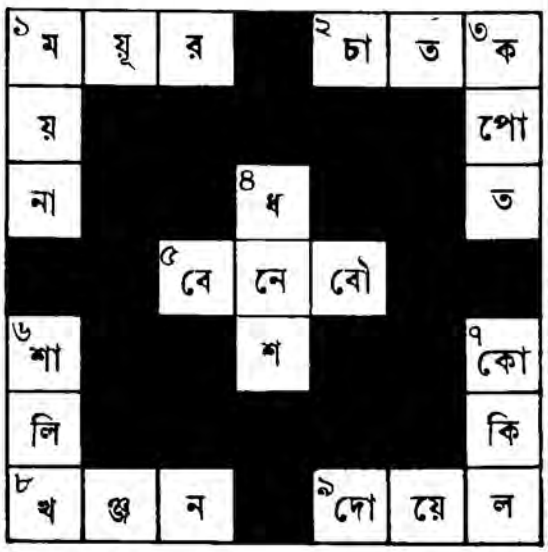

১ ম	য়ূ	র	■	২ চা	ত	৩ ক
য়	■	■	■	■	■	পো
না	■	■	৪ ধ	■	■	ত
■	■	৫ বে	নে	বৌ	■	■
৬ শা	■	■	শ	■	■	৭ কো
লি	■	■	■	■	■	কি
৮ খ	গু	ন	■	৯ দো	য়ে	ল

অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল ছোট্‌কা।

হিটারে ছোট একটা চাটু বসিয়ে রুটি সেঁকছিল সেজদি। বাবার অফিসের টিফিন। তিনখানা টোস্ট প্রতিদিন চাই বাবার। ছোট চাটু। দু-স্লাইস পাউরুটি একসংগে পাশাপাশি বসানো যায়। দুটো রুটি প্রথমে চাপিয়ে দেয় সেজদি। একপিঠ সেঁকা হয়ে গেলে রুটি দুটো উল্টে দেয়। এ-ভাবে দুটো রুটির দুপিঠ সেঁকে নামিয়ে নিয়ে তৃতীয় রুটিটি চাপিয়ে দেয় চাটুতে। একখানা রুটিকেই ফের এপিঠ-ওপিঠ করে সেঁকে।

"কী দেখছ ছোট্‌কা অমন করে ?" সেজদির নজর পড়ে ছোট্‌কার দিকে।

"দেখছি তুই কত সময় নিস তিনখানা রুটি সেঁকতে।" ছোট্‌কা মজার মুখ করে বলল।

"সময় নেবার কী আছে," সেজদি ঠোঁট উল্টে বলল, "যা ছোট চাটু। শুধু সেঁকতেই পাক্কা আট মিনিট চলে যায়।"

"কী করে ?" ছোট্‌কার প্রশ্ন শুনে সেজদি যেন অবাক হল। তারপর বলল, "একপিঠ সেঁকতে পুরো দু-মিনিট লাগে। দুটো রুটির দু-পিঠ সেঁকতে গেল চার মিনিট। তৃতীয় রুটিটার দু-পিঠ সেঁকতেও সেই চার মিনিট। মোট আট মিনিট। একেবারে ঘড়ি-ধরা।" রুটিতে মাখন মাখাতে থাকে সেজদি।

"ঘড়ি-ধরা কিন্তু বুদ্ধি-ধরা নয়।" ছোট্‌কা বলে উঠল, "আজকের টিফিনটা দিয়ে আয়। কাল থেকে

ছ-মিনিটে রুটি সেঁকার কা
সেজদি টিফিন দিয়ে এ
বড়ো চাটু কিনে আনবে আ
"না, এই ছোট চাটুতেই
তিনখানা রুটির এ-পিঠ ও-
অঙ্কের মতো করে সেজদিকে
সব শুনে সেজদি ত

আগামী সংখ্যায় শুরু
মজার খেলা। শিখে নিলে
দিতে পারবে।

কেটে বলল, "ইস, কত সম
ইলেকট্রিক খরচাও। কাল
বলেছ তো ছোট্‌কা।"
মাথা খাটিয়ে বার কর
জোগাল ছোট্‌কা যাতে ওই
রুটি সেঁকতে আট মিনিটে
লাগে ? এটাই এবারের প্রথম
দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটা ঝ
দশজন ছেলের মধ্যে এমনভ
দিতে পার যাতে প্রত্যেকে
ঝুড়িতেও একটা কমলালেবু
তৃতীয় ধাঁধা ॥ মাঝরাত্তিরে

আচ্ছা

প্রঃ ফকুদার মাথায় টাক যোগ হলে কী হয় ?
উঃ তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন, কারণ জাপানের প্রধানমন্ত্রীর নাম টাকেও ফকুদা।

প্রঃ কোন মাছ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ?
উঃ কই।

প্রঃ কোন্ জায়গা বেদম ভারি ?
উঃ জগদ্দল।

প্রঃ এশিয়ার কোন দেশ ক্রি
উঃ কোরিয়া।

প্রঃ কোন দেশের নাম যা
উঃ জাপান।

প্রঃ কোন দেশ বলছে আ
উঃ মংগোলিয়া।

প্রঃ কোন্ দ্বীপ বাতাসের
উঃ হাওয়াই।

...ধা

...য়দা শিখিয়ে দেব।"
...সে বলল, "তার মানে তুমি
...জে।"
...ই বুদ্ধি থাকলে ছ-মিনিটে
...পিঠ সেঁকা যায়।" ছোটকা
...ক বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারটা।
... একেবারে অবাক। জিভ

...হবে 'আটখানা। দারুণ
...ল বন্ধুদের তাক লাগিয়ে

...য় বেঁচে যায়। বেঁচে যায়
...থেকে তাই করব। দারুণ

...তে পার, এমন কী বুদ্ধি
... ছোট চাটুতেই তিনখানা
...টের বদলে ছ-মিনিট সময়
...য় ধাঁধা।
...ঝুড়িতে দশটা কমলালেবু।
...ভাবে লেবুগুলো ভাগ করে
... একটা করে পায়, আবার
... থাকে ?
... ঘুম ভেঙে দেখি তুমুল

বৃষ্টি পড়ছে। যাকে বলে একেবারে আকাশভাঙা বৃষ্টি। ৭২ ঘণ্টা পরে কি রোদ্দুর ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ বাবার যখন ৩১ বছর বয়েস, তখন আমার বয়েস ৮। বাবার এখনকার বয়স আমার এখনকার বয়সের দ্বিগুণ। এখন আমার বয়স কত?

*

গতবারের উত্তর ॥ ১। সত্যজিৎ রায়ের গল্প 'সমাদ্দারের চাবি।' 'আরো এক ডজন' বইতে রয়েছে। (২) সব পিছনে যে-লোকটি তার পক্ষে তখনই নিজের মাথার টুপির রঙ বলা সম্ভবপর যদি সামনের দুজনেরই মাথায় সাদা টুপি দেখতে পায়। তা সে নিশ্চিত দেখেনি। অর্থাৎ সামনের দুজনের মাথায় হয় দুটি লাল, নয় একটি সাদা ও একটি লাল টুপি সে দেখেছে। তাই সে 'না' বলেছে। মাঝের লোকটি এই উত্তর শোনার পর যদি সামনের লোকের মাথায় সাদা টুপি দেখতে পেত, নিঃসংশয় হয়ে বুঝতে পারত, তার মাথার টুপির রঙ সাদা নয়। কেননা, পেছনের লোকটি দুটি সাদা টুপি দেখেনি। কিন্তু মধ্যের লোকটিও যখন 'না' বলল তখন বোঝা গেল, একেবারে সামনের লোকের মাথায় লাল রঙের টুপি রয়েছে। সে কথাই জানাল সে। (৩) ৩/১০ (৪) উল্টো করে ধরলে অঙ্কটি সত্যি হয়ে উঠবে। পুরো পাতাটাই উল্টো করে ধরে দেখো।

সত্যসন্ধ

...লো তো

...য়াপদ?

... পাইবেন?

... নিলাম?

...মত?

প্রঃ যে মাছ ধরে আর যে পকেট কাটে তাদের মধ্যে মিল কোথায়?

উঃ দুজনেই জেলে।

প্রঃ যে কাজ তিনজন লোক রোজ আট ঘণ্টা করে পরিশ্রম করে একুশ দিনে শেষ করে সেই কাজ বারোজন লোক রোজ এক ঘণ্টা করে পরিশ্রম করে শেষ করার চেষ্টা করলে কী হবে?

উঃ বুঝতে হবে লোকগুলো ফাঁকি মারার তালে আছে।

প্রঃ কোন বাজনা দিয়ে বাসন মাজা হয়?

উঃ খোল।

ভানুমতী

কিসের ফটো

উত্তর আগামী সংখ্যায় / ছবি তুলেছেন তপন দাশ

গতবারে ছিল টুপি-পরা ছোট্ট একটি ছেলের ছবি। পিছন থেকে তোলা।

কিসের ছবি

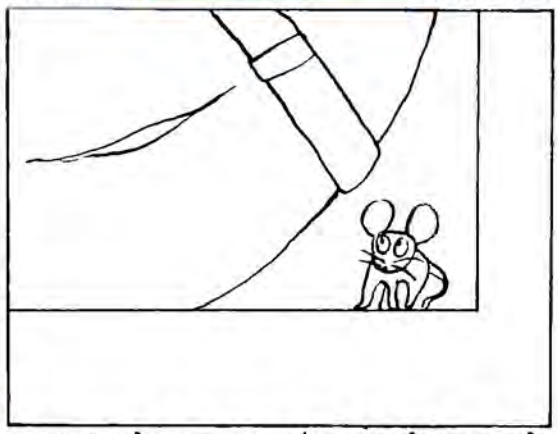

আমার বাড়িতে মানুষের চাইতে পশুপাখি অনেক বেশি, তারা তাদের রাজত্বে বেশ ফুর্তিতেই থাকে। খাচ্ছে দাচ্ছে, খেলাধুলোও করছে, আবার নিরিবিলি জায়গা খুঁজে ঘুমোচ্ছেও নির্বিঘ্নে। আমি থাকি আমার মতো, তারা থাকে ওদের মতো। কেউ কাউকে বিরক্ত করি না। মাঝে সাজে হয়তো ঘুমোচ্ছি, কিংবা বই খুলে পড়ছি, হঠাৎ কয়েকটা বেড়াল বিচ্ছিরি সুর করে ঝগড়া শুরু করে দিল। যেই ধমক দিলাম, অমনি চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য, ঘণ্টা দুয়েকের আগে কাউকে আর দেখা যাবে না।

কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, আমার লেখাপড়ার কাগজ কোথাও কোথাও ছেঁড়া। বুঝতে পারছি, দুষ্টু একটা নেংটি ইঁদুরের কাজ। ওর যত ঝোঁক আমার লেখাপড়ার কাগজ বইয়ের পর। জানি না কেন এত রাগ এসবের ওপর। হয়তো ভেবেছে বিদ্যা চিবিয়ে খেলে পণ্ডিত হতে পারবে। সে যাই হোক, ওর পণ্ডিত হওয়া আর হল না। সারা বাড়ি আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম ওকে। যেমন করে হোক, পাকড়াতে হবেই। কিন্তু বৃথা খোঁজাখুঁজি, পেলাম না কিছুতেই। বোধ-হয় বুঝতে পেরেছে আমি খুঁজছি ওকে, তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন লিখতে বসেছি, হঠাৎ দেখি মেনি বেড়ালটা আমার চেয়ারের সামনে একা-একা গর্জন করছে। ইঁদুর দেখলেই ও অমন করে। কিন্তু কোথায় ইঁদুর? আমি দেখতে পাচ্ছি না, অথচ মেনি ঠিক দেখেছে! বল তো কোথায়? তিনি লুকিয়েছেন আমারই ঠিক পেছনে, অর্থাৎ আমার আর চেয়ারের ফাঁকে। ভাল করে দেখো (অবশ্যই মেনি বেড়াল হয়ে দেখা চাই), তুমিও দেখতে পাবে।

চিত্রপাল

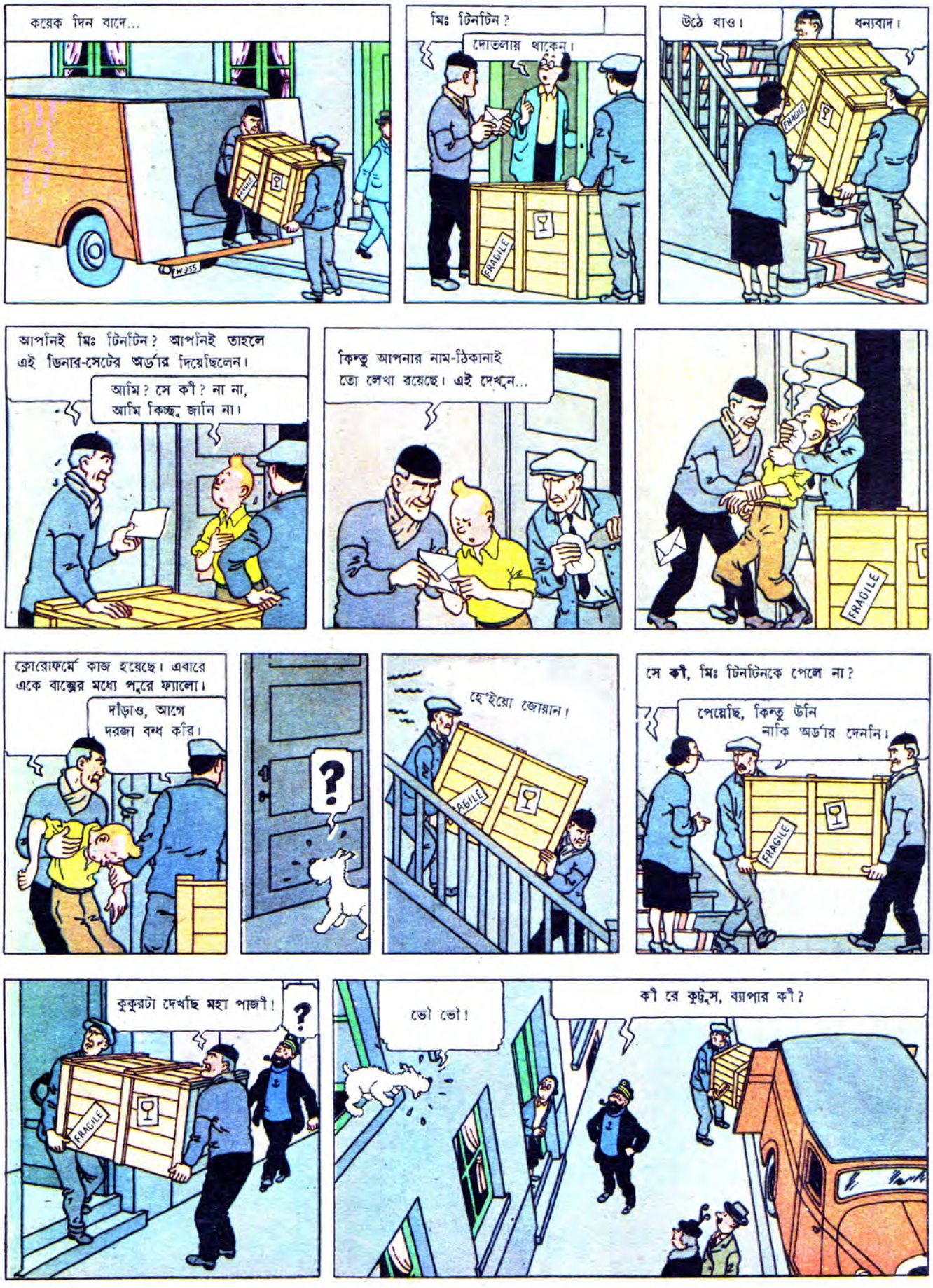
কয়েক দিন বাদে...
FRAGILE
মিঃ টিনটিন?
দোতলায় থাকেন।
FRAGILE
উঠে যাও।
ধন্যবাদ।
FRAGILE
আপনিই মিঃ টিনটিন? আপনিই তাহলে এই ডিনার-সেটের অর্ডার দিয়েছিলেন।
আমি? সে কী? না না, আমি কিছু জানি না।
কিন্তু আপনার নাম-ঠিকানাই তো লেখা রয়েছে। এই দেখুন...
FRAGILE
ক্লোরোফর্মে কাজ হয়েছে। এবারে একে বাক্সের মধ্যে পুরে ফ্যালো।
দাঁড়াও, আগে দরজা বন্ধ করি।
?
হেঁইয়ো জোয়ান!
FRAGILE
সে কী, মিঃ টিনটিনকে পেলে না?
পেয়েছি, কিন্তু উনি নাকি অর্ডার দেননি।
FRAGILE
কুকুরটা দেখছি মহা পাজী!
?
FRAGILE
ভৌ ভৌ!
কী রে কুটুস, ব্যাপার কী?

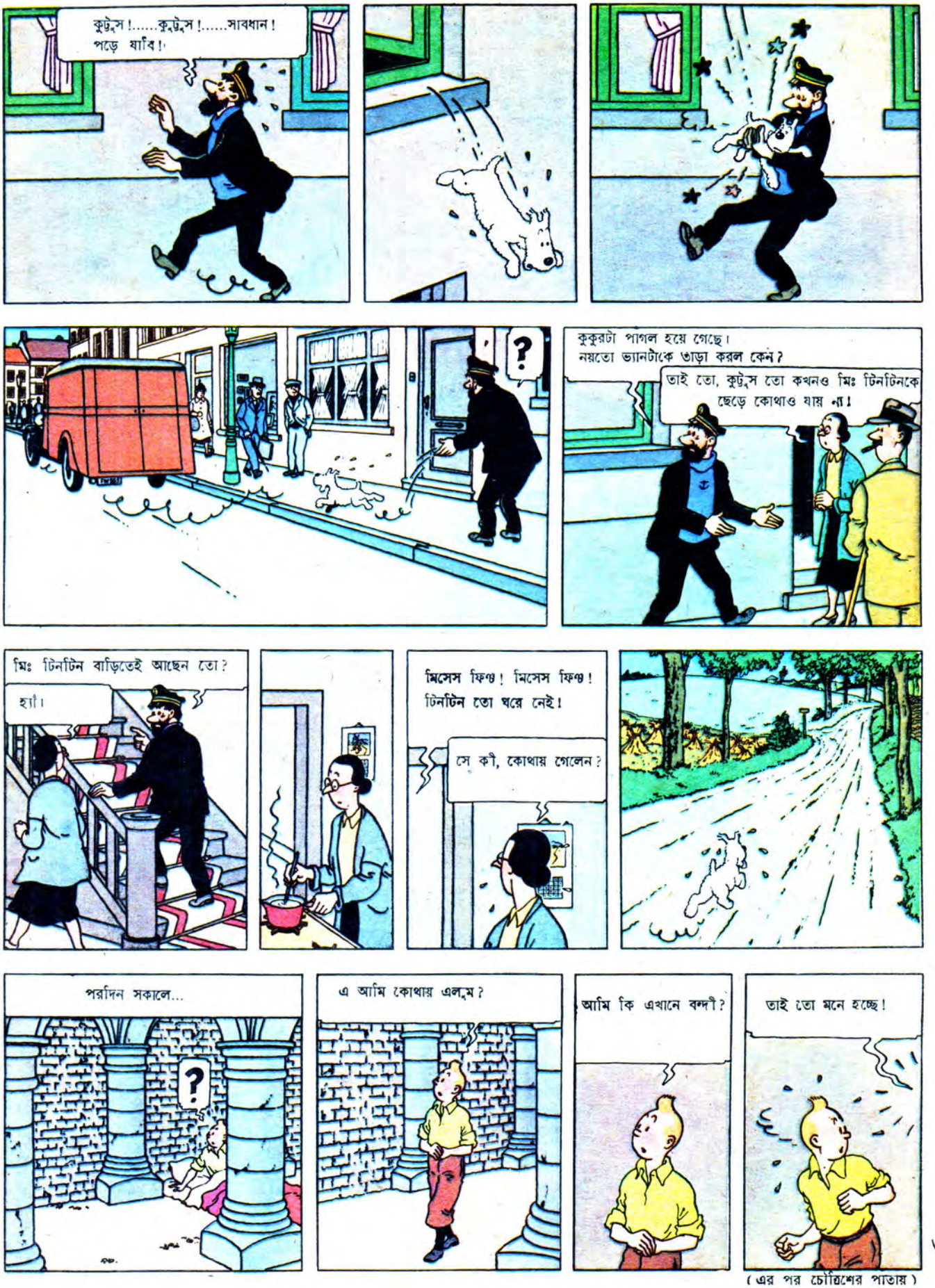

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

ময়ূর গড়া ? সে তো জানা-ই এখন এসো, পেখম বানাই।

মা দুগ্‌গার ছেলে কার্তিককে তো দেখেছ, রূপ যেন আর গায়ে ধরে না। তা বলে ভেবো না বুদ্ধিটা খাটো। মোটেই না। বুদ্ধিমান না হলে আর এমন বাহনটি বেছে নেন? অমন যে নাদুস-নুদুস, গাবদা-গোবদা গণেশ, তার বাহনটিকে দেখো। কী, না, এক রত্তি একটা নেংটি ইঁদুর। এমনিতে গুণের শেষ নেই। কিন্তু বাহনের বেলায় যেন তালকানা। পছন্দ বটে কার্তিকের। জানো নিশ্চয়ই, ময়ূর আমাদের জাতীয় পাখি। কী বিরাট সম্মান, তাই না? ময়ূরের গলার স্বর কিন্তু মোটেই মিষ্টি নয়। বিতিকিচ্ছিরি। তাহলে এত বড় সম্মান পেল কী করে? আমার কী মনে হয় জানো? পেখমের জোরে। যেন সাত রাজ্যের সাতটা শিল্পী, সাত দিন সাত রাত ধরে এঁকেছে সাত রঙে।

এসব শুনে ভয় পেও না। ময়ূর গড়ার চেয়ে তার পেখম বানানো কিন্তু ঢের সোজা। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা দ্যাখো তবে।

পূর্ণেন্দু পত্রী

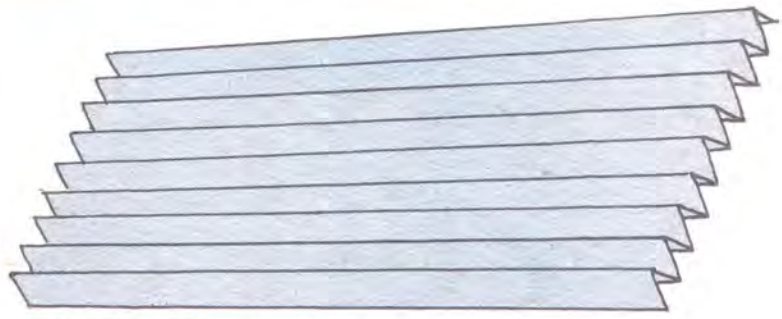

(১) চৌকো কাগজ নাও এক ফালি। সেটাকে এমনভাবে ভাঁজ করো যেন দেখতে হয় ঢেউ-খেলানো করোগেটের টিনের মত।

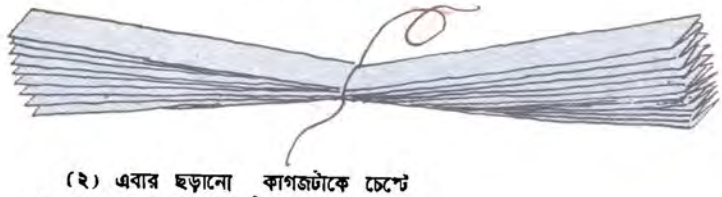

(২) এবার ছড়ানো কাগজটাকে চেপ্টে এক জায়গায় এনে মাঝামাঝি জায়গায় বেঁধে নাও সরু সুতোয়।

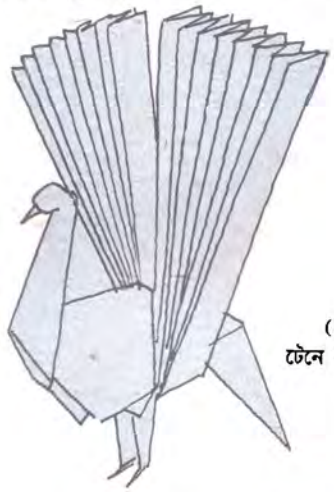

(৩) এরপর ওটাকে মাঝামাঝি মুড়ে নিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দাও ময়ূরের পেটের কাছাকাছি।

(৪) এবার জমে থাকা ভাঁজগুলোকে টেনে ছড়িয়ে দাও দুপাশে।

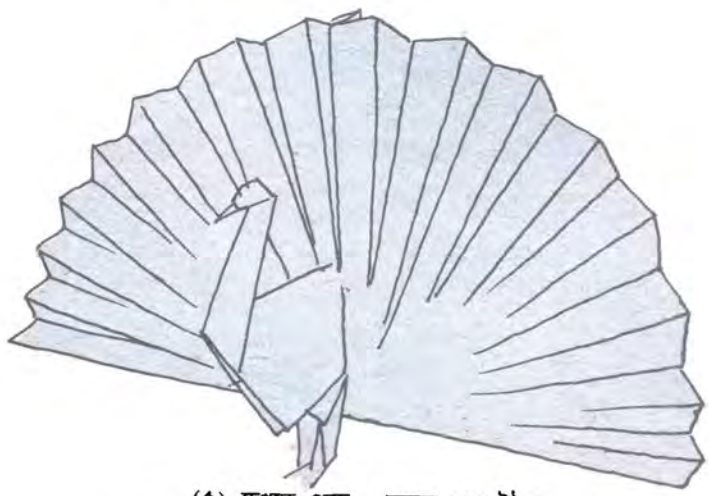

(৫) দেখতে পাচ্ছ, জ্যান্ত হয়ে উঠল এক পলকে। যেন নাচবে এখুনি।

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

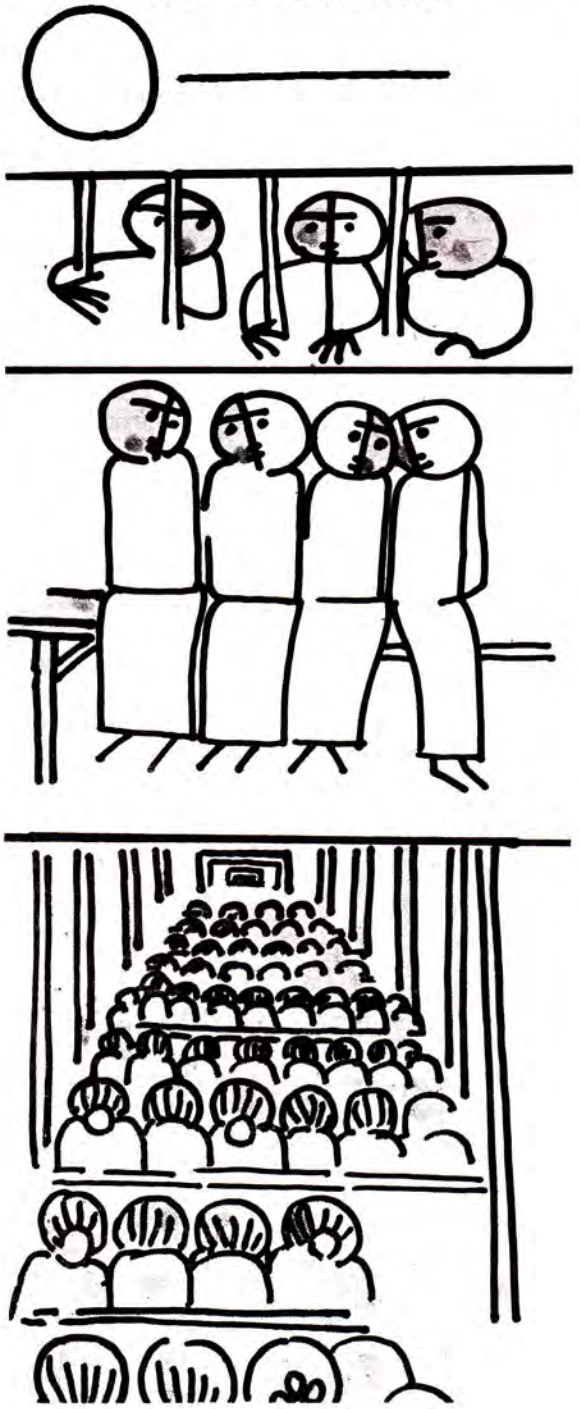

এক আকার অনেক নকশা

সেই দুটি আকার। চলাফেরা মানুষের মেলা। তোমাদের কিছু এ'কে দেখিয়েছি। এবারও দেখালাম, চিন্তাকে সহজ করার জন্য। এবার নিশ্চয়ই ভিড়, থিয়েটার আর রাস্তা ভরা মানুষ আঁকতে তোমাদের অসুবিধা হবে না। এমন ভাবেই একটু সাজালেই তোমাদের কচি হাতের দোলায় হাজারো খুশিভরা মানুষ দেখা যাবে নানান কাজের মধ্য দিয়ে।

শেখো

কারিগর

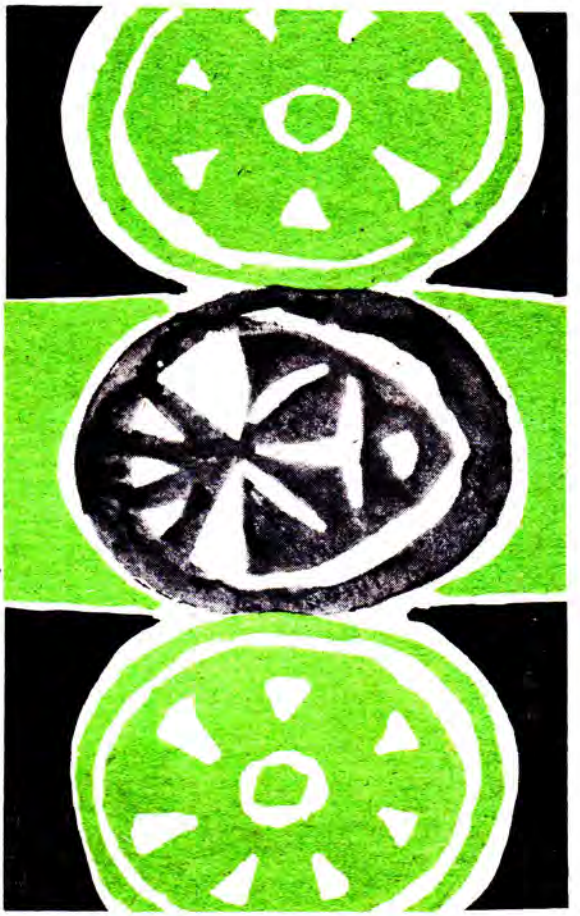

ছাপের কাজ

রঙের সংগে আঠা আর গ্লিসারিন মিশিয়ে নানান ছোপ নেওয়ার কাজের নমুনা দেখেছ আর জেনেছ।

এবার জানো, কেমনভাবে একই ছাপ নেওয়া যাবে বার বার। এ-ধরনের কাজের জন্য জোগাড় করো—আলু, ছুরি, নরুন, ব্লেড, রং, কাগজ আর টুকরো-কাপড়।

শুরু করো—প্রথমে তোমার পছন্দমত মাপের আলু নিয়ে তাকে সমানভাবে দুভাগ করে তার ওপর পেনসিল দিয়ে তোমার পছন্দমত নকশার ছক করে ব্লেড বা নরুন দিয়ে তুলে বাদ দাও যে-জায়গার ছাপ রাখতে চাও না। এবার এক টুকরো কাপড় তোমার ইচ্ছেমত রঙে ভিজিয়ে নিয়ে পাট করে রাখো কাছে। আলুর ওপর নকশার কাজ শেষ হ'লে, সেই রঙিন কাপড়ের ওপর চা ফেলে রঙে ভিজিয়ে নিয়ে ইচ্ছেমত ছোপ দিতে পারো যেখানে তোমার ইচ্ছে। দেখবে বইয়ের মলাট, বাক্স এরকম কত জিনিস আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করলে হাজারো রং দিয়ে এর জৌলুস বাড়ানোয় কোন বাধা নেই। আর-একটা কথা জানিয়ে রাখি—ক্লাইলিন বা ফেব্রিক রং দিয়ে ছাপ তুলে নিজের জামা, বাড়ির পর্দা, চাদর ইত্যাদিতে ছাপ দিয়ে নিতে পারলে—ছাপাখানায় যেতেই হবে না। দেখো না চেষ্টা করে।

জেনে রাখো—(১) আলু কাটার পরই যে জল বের হবে তা শুকনো কাপড় দিয়ে টেনে নিয়ে কাজ শুরু করবে। (২) একই নকশী আলু দিয়ে নানান রঙে ছোপ তোলার জন্য প্রতিবার ভাল করে জলে ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছে নেবে। (৩) ফেব্রিক বা ক্লাইলিন রঙের কাজের সময় কাপড়ে সমানভাবে চাপ দেবে। (৪) আলুতে বেশী রং তুললে ছাপ ছড়িয়ে পড়তে পারে। (৫) ভেজা রঙিন কাপড় পলিথিনে রাখলে শুকিয়ে যাবে না। (৬) কোন অক্ষরের ছাপ নিতে গেলে তা উল্টোভাবে কাটতে হবে।

(একাত্রিশের পাতার পর)

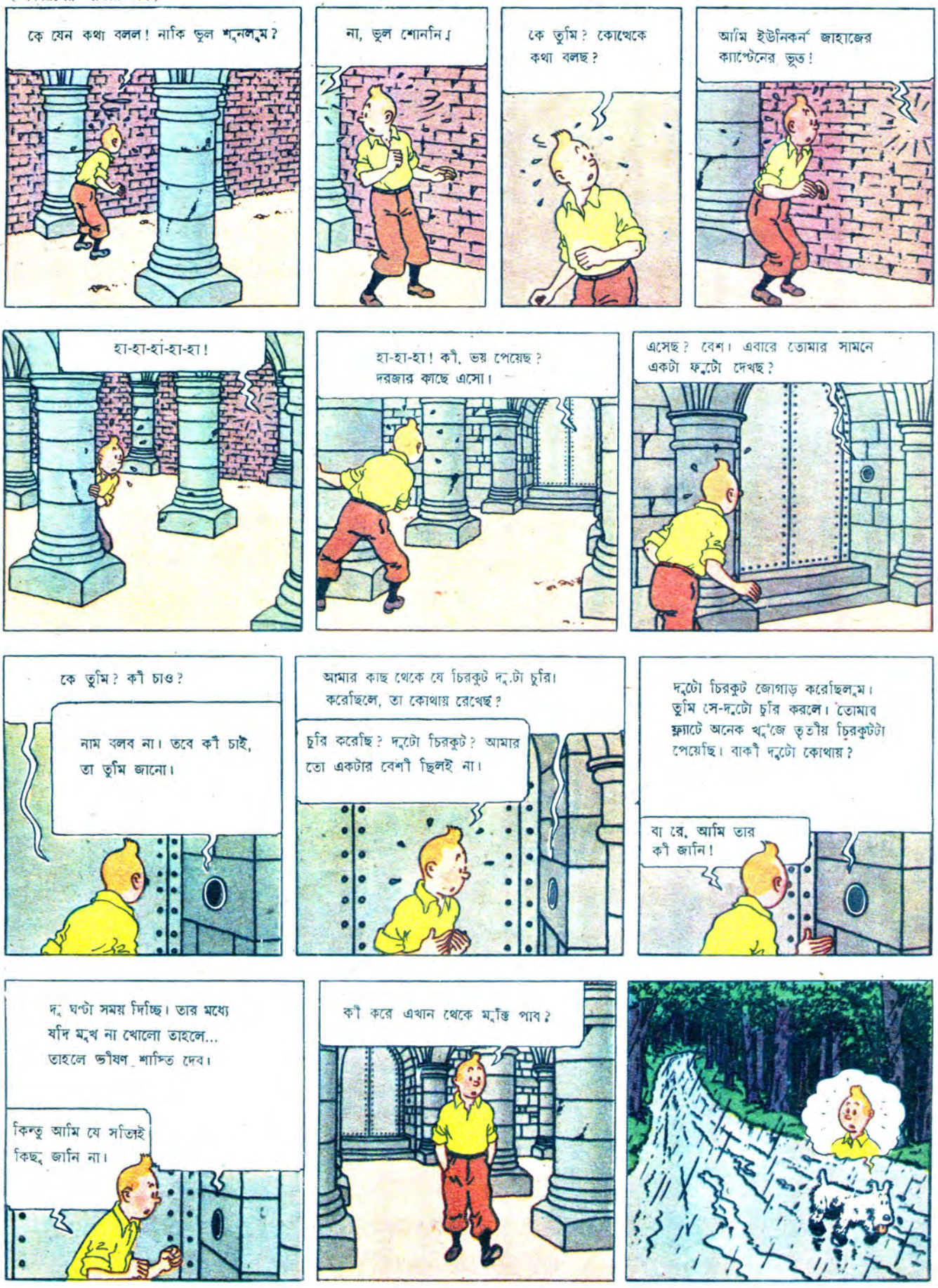

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ দ্বীপের রাজা

আগে যা ঘটেছে

'ভয়ংকর সুন্দর' উপন্যাসের সেই সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছেন আন্দামানে। এর আগে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা আন্দামানে এসে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এবারও ওঁরা দেখেছিলেন কয়েকটি সাহেবকে মোটরবোট চেপে পালাতে। এখানে একটা দ্বীপের জঙ্গলের মধ্যে জারোয়া নামে খুব হিংস্র আদিবাসীরা থাকে. বাইরের লোক দেখলেই তারা বিষাক্ত তীর ছোঁড়ে। আন্দামান এসে পরেশ দাশগুপ্ত নামে একজন লোকের সঙ্গে সন্তু আর কাকাবাবু মোটরবোট চেপে সমুদ্রে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ কাকাবাবু জোর করে একটা দ্বীপে নেমে পড়েন। সন্তুও চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে। সেই দ্বীপটাই জারোয়াদের। রাত্তিরের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা দেখতে পান, সেই সাহেবগুলোর সঙ্গে জারোয়াদের যুদ্ধ চলছে। শেষ পর্যন্ত সাহেবরা হেরে গিয়ে বন্দী হয়। এর মধ্যে সন্তু আর কাকাবাবু ছিটকে পড়েছিলেন দুদিকে। কাকাবাবুকে খুঁজতে খুঁজতে সন্তু এসে পৌঁছয় একটা অদ্ভুত জায়গায়। সেখানে একটা গোলমতন জিনিস থেকে নানারকম আগুন বেরুচ্ছে, সেই আগুন ঘিরে বসে আছে শত শত জারোয়া। আর তাদের মাঝখানে সাদা চুল-দাড়িওয়ালা এক থুত্থুরে বুড়ো। সেই জারোয়াদের রাজা। রাজার নির্দেশে এক-একজন বন্দী সাহেবকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আগুনের মধ্যে। এমন সময় রিভলবার ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেখানে এসে হাজির হলেন কাকাবাবু। সেই বুড়ো রাজার বুকের কাছে রিভলবার তুলে দাঁড়ালেন। বুড়ো রাজা কথা বললেন পরিষ্কার বাংলায়। জানা গেল, তিনি একজন বাঙালী বিপ্লবী, বহুকাল আগে আন্দামান জেল থেকে পালিয়েছিলেন। বুড়ো রাজার কুঁড়েঘরে গিয়ে কাকাবাবু আর সন্তু কথা বলছে, এমন সময় বাইরে শোনা গেল গোলাগুলির শব্দ। সেই সাহেবগুলো বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর—

১৩

বুড়ো রাজা বললেন, "এবার ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকে আসুন। বাইরে যাবেন না!"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঘরের মধ্যে ঢুকলেও বাঁচা যাবে না। ওদের কাছে লাইট মেশিন গান আছে। ওরা আমার লোকজনকে মারছে!"

সত্যিই তাই। কয়েকজন জারোয়া প্রাণের ভয় না করে সাহেবদের দিকে তাড়া করে আসছিল, সাহেবরা কট্ কট্ কট্ কট্ করে গুলি চালাল, সঙ্গে সঙ্গে তারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জারোয়াদের বিষাক্ত তীর দু'জন সাহেবের গায়ে লাগল, কিন্তু তাতে তাদের কিছুই হল না। সাহেবরা আগেই বিষ প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিয়ে নিয়েছে।

কাকাবাবুকে ঠেলে বুড়ো রাজা বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। দু'হাত উঁচু করে ইংরিজিতে চেঁচিয়ে বললেন, "হোল্ড অন্!"

সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহেব হিংস্রভাবে ঘুরে দাঁড়াল সেই দিকে। তার হাতে একটা বেঁটে আর মোটা ধরনের বন্দুক। সন্তু বুঝল, ওটারই নাম বোধহয় লাইট মেশিন গান।

সন্তুর মনে হল, সাহেবটি এক্ষুনি বুড়ো রাজাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু বুড়ো রাজার দারুণ সাহস। তবু তিনি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে একপা একপা করে এগিয়ে গেলেন সাহেবদের দিকে। তারপর ইংরিজিতে বললেন, "তোমরা আমার লোকদের শুধু-শুধু মেরো না। তোমরা যা চাও, তাই নিয়ে যাও।"

তিনি জারোয়াদের দিকে তাকিয়ে কী একটা অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করলেন। অমনি তারা সার বেঁধে পেছিয়ে যেতে লাগল। সেইসঙ্গে মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। সেই শব্দটা ঠিক কান্নার মতন।

আর-একজন সাহেব এগিয়ে এসে খুব নিষ্ঠুরভাবে প্রচন্ড এক চড় কষাল বুড়ো রাজার গালে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সাহেবটা বুড়ো রাজার বুকের ওপর পা তুলে বলল, "একে এক্ষুনি মেরে ফেলব! এই বুড়োটাই যত নষ্টের মূল। এর হুকুমেই আমাদের একজন বন্ধুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এতক্ষণে আমাদেরও মেরে ফেলত।"

মেশিনগান-হাতে সাহেবটি বলল, "ওকে এক্ষুনি মেরো না, একটু পরে। ওর কাছ থেকে আরও কিছু খবর জানা যেতে পারে।"

যে লতা দিয়ে সাহেবদের বাঁধা হয়েছিল, সেই লতা দিয়েই ওরা বেঁধে ফেলল বুড়ো রাজাকে।

সেই অবস্থাতেও বুড়ো রাজা বললেন, "আমাকে মারার চেষ্টা করো না। তাহলে তোমরা একজনও বেঁচে ফিরতে পারবে না এখান থেকে। তোমরা যা চুরি করতে এসেছ, তাই নিয়ে ফিরে যাও!"

একজন সাহেব বুড়ো রাজার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল।

সন্তু আর কাকাবাবু সেই কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। মাটিতে শুয়ে থাকলে হঠাৎ গায়ে গুলি লাগে না। বুড়ো রাজার এই দুর্দশা দেখে ওরা শিউরে উঠল।

কাকাবাবু আফশোস করে বললেন, "ইস, আমার রিভলবারটা যদি এখন কাছে থাকত!"

সন্তু দেখল, খানিকটা দূরে মাটির ওপরে কাকাবাবুর রিভলবারটা পড়ে আছে। একজন সাহেবের পায়ের কাছে।

কিন্তু চারজন সাহেবের হাতে বন্দুক একজনের হাতে

লাইট মেশিন গান, কাকাবাবু শুধু একটা রিভলবার নিয়ে কী করতেন?

একজন সাহেবের কাঁধে ঝোলানো আছে একটা ব্যাগ। সে সেটা খুলে ফেলল। তার মধ্য থেকে বেরুল অনেক কিছু। নানারকমের যন্ত্রপাতি আর একটা খুব মোটা ফিতের মতন জিনিস গোল পাকানো। সেটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল, সেটা আসলে একটা বিরাট লম্বা ক্যাম্বিসের জলের পাইপ। তার একটা মুখ ধরে দু'জন সাহেব ছুটে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

একটু বাদেই সেই পাইপটা ফুলে উঠল আর তার অন্য মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল। আর দুজন সাহেব সেটা নিয়ে গেল আগুনটার দিকে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "ওরা ঝর্ণা থেকে জল আনছে।"

সন্তুও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওরা আগুন নেভাতে চাইছে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "যে পাথরটা থেকে ঐ আগুন বেরুচ্ছে, সেটার সাংঘাতিক দাম। কোটি কোটি টাকা। ওরা সেটা চুরি করতে এসেছে। ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো গ্রহের টুকরো কিংবা উল্কা। হয়তো ওর মধ্যে এমন অনেক নতুন ধাতু আছে, যা পৃথিবীর মানুষ কখনো দেখেনি। ওগুলো পেলে আমাদের বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম উল্টে যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "সাহেবগুলো ঐ পাথরটা যে এখানে আছে তা জানল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে কোথায় কখন উল্কাপাত হয়, অনেক বৈজ্ঞানিক তার খবর রাখেন। সবগুলোরই সন্ধান পাওয়া যায়, শুধু এটারই পাওয়া যায়নি। তবে এই লোকগুলো বৈজ্ঞানিক নয়। এরা যেমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর, তাতে মনে হয় এরা একটা ডাকাতের দল। কোনো বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছে।"

সন্তু বলল, "ওদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবীও তো রয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঐ পাঞ্জাবীটি ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা দিয়ে হাত করেছে ওকে।"

তারপর আর ওরা কথা বলতে পারল না। অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল আগুনের দিকে।

সাহেবরা পাইপে করে আগুনের মধ্যে জল ছেটাতেই একটা আশ্চর্য সুন্দর জিনিস হল। আগুনের মধ্যে জল পড়তেই সেই জল লক্ষ লক্ষ রঙিন ফুলঝুরি হয়ে উঠে আসতে লাগল ওপরের দিকে। সমস্ত জায়গাটা লাল-নীল আলোয় ভরে গেল। আগুন নেভার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না।

সাহেবরা তবু থামবে না। তারা জল ছিটিয়েই যেতে লাগল। আর সন্তু একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল সেই ফুলঝুরি। এত সুন্দর রঙের খেলা সে কখনও দেখেনি। এখন আর ভয়ের কথা, বিপদের কথা তার মনে পড়ছে না।

কাকাবাবু বললেন, "ও আগুন এই পৃথিবীর নয়। পৃথিবীর জল দিয়ে ঐ আগুন নেভানো যাবে না। ঐ আগুনেই পাথরটা পুড়ে পুড়ে একদিন শেষ হয়ে যাবে।"

সাহেবরা এবার একটা কৌটো থেকে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়াতে লাগল আগুনে। তাতেও কাজ হল না কিছুই। পাউডারগুলো পড়তেই দপ্ করে এক-একটা শিখা বেরিয়ে আসতে লাগল।

তাতেও নিরাশ হল না সাহেবরা। এবার একটা সরু লম্বা গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে মেশিন গানের গুলি চালাল পঁচিশ তিরিশটা। তারপর গাছটাকে ধরে কাৎ করতেই সেটা ভেঙে গেল মড়াত করে।

ওরা চারজনে মিলে সেই গাছটাকে বয়ে এনে আগুনের মধ্যে তার একদিকটা ঢুকিয়ে দিল অনেকখানি। গুম করে একটা শব্দ হল। পাথরটার গায়ে গাছটার ধাক্কা লেগেছে।

তখন সাহেবরা উৎসাহ পেয়ে গাছটাকে আবার বার করে এনে খানিকটা পিছিয়ে এল। তারপর জোরে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল আবার। আবার গুম করে শব্দ হল, আগুনের

শিশুদের—
কিশোরদের—
যত ছোটদের বই

শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের নাম আমাদের দেশে প্রবাদে পরিণত হলেও, তাঁর অনেক বই যেমন এখন পাওয়াও যায় না, তেমনি তাঁর এমন বহু লেখা আছে, যেগুলি বই হয়ে কোনও দিন বেরোয়ইনি। হয় সেগুলি কোনও সাময়িকপত্রে কখনও প্রকাশিত হয়েছিল, নয়তো কোথায়ও কখনও ছাপা হয়নি। এমন সব দুর্লভ লেখা উদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়েছে সুকুমার রায়ের এইসব রচনাবলী, যেগুলি আর কোথাও পাওয়া যাবে না :

সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্‌পো ৮.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫ ০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার
পিনকুর ডাইরি ২.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩.০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

নকুল মুখোপাধ্যায়
দেবতার পাহাড় ৩.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০
শরৎ-কথামালা ১০.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
হড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
সত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫.০০

বিমল কর
ওআওার মামা ৬.০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার বেক ৪.০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়
দেশ বিদেশের বিভানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

শিখাগুলো যেন নড়ে-চড়ে উঠল খানিকটা।

সন্তুরা দম বন্ধ করে দেখছে। তারা বুঝতে পেরেছে সাহেবদের মতলবটা কী! তারা গাছ দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে আগুনের ভেতর থেকে পাথরটাকে বার করে আনতে চাইছে। কিংবা আগুনসুদ্ধই পাথরটাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে ঝর্ণার মধ্যে ফেলবে।

কিন্তু একটু পরেই আর একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল। পাথরটা সহজে নড়ানো যায় না বলে ওরা খুব জোরে জোরে ধাক্কা মারছিল। এতবার ধাক্কা মারতে গিয়ে ঝোঁক সামলাতে না পেরে একজন সাহেব আগুনটার খুব কাছে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের মতন আগুন তাকে টেনে নিল ভেতরে। ঠিক যেন একটা হাতের মতন একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে টেনে নিয়ে গেল লোকটিকে। সে একটা বীভৎস চিৎকার করে উঠল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

শেষ মুহূর্তে সন্তু চোখ বুজে ফেলেছিল। আবার যখন চোখ মেলল, তখন দেখল, গাছটা ফেলে দিয়ে অন্য সাহেবরা ভয়ে পালিয়ে আসছে। কাকাবাবু কপালের ঘাম মুছছেন।

সাহেবটা আগুনে পুড়ে যাবার সময় দূরের জারোয়ারা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে মেশিন গান হাতে সাহেবটি সেদিকে এক ঝাঁক গুলি চালাল।

বুড়ো রাজা হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই আবার হুকুমের সুরে চেঁচিয়ে বললেন, "ওদের মেরো না! আমি হুকুম দিলে ওরা তোমাদের এখনো শেষ করে দিতে পারে!"

সাহেবটা অসম্ভব রেগে গেল সেই কথা শুনে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বুড়ো বদমাশ, এবার তোকেই আগুনে পোড়াব। এই ল্যারি, এই বুড়োটাকে তুলে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দে তো!"

অন্য সাহেবরা কাছাকাছি এক জায়গায় হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন সঙ্গী তাদের চোখের সামনে আগুনে পুড়ে গেল! ব্যাপারটা ওরাও যেন সহ্য করতে পারছে না।

মেশিনগান-হাতে সাহেবটিই বোধহয় ওদের সর্দার। সে কিন্তু দমেনি। সে আবার চিৎকার করে বলল, "ল্যারি. এদিকে এসো, এই বুড়োটাকে আগুনে ফেলে দাও!"

ওপাশ থেকে ল্যারি উত্তর দিল, "জ্যাক, পাথরটা পাবার কোনো আশা নেই। ওটা খুনে আগুন। চলো, আমরা এবার পালাবার চেষ্টা করি। নইলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব!"

জ্যাক বলল, "পালাবার আগে প্রতিশোধ নিতে হবে। এই বুড়োটাকে আমার চোখের সামনে আগুনে পোড়াতে চাই। আমি জারোয়াদের দিকে মেশিনগান তুলে রাখছি, তুমি একে আগুনে ফেলে দাও!

ল্যারি এগিয়ে এল।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "সন্তু, আমার রিভলবারটা ..."

সন্তু বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে এগুল। রিভলবারটা যেখানে পড়ে আছে, সাহেবটা সেখান থেকে খানিকটা দূরে। সন্তু মাটির ওপর দিয়ে শুয়ে শুয়ে গেলে বোধহয় ওরা তাকে দেখতে পাবে না।

এই সময় তিনবার কাক ডেকে উঠল।

অর্থাৎ ভোর হয়ে আসছে। আলো ফোটার আর বেশী দেরি নেই। আরও কয়েকটা পাখির ডাক, আরও কী যেন শব্দ হচ্ছে দূরে।

সন্তু রিভলবারটা নিয়ে ফিরে আসার সময় পেল না। ল্যারি এসে বুড়ো রাজাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিতেই

কাকাবাবু আর থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাঙ্গারুর মতন লাফাতে লাফাতে ছুটে গেলেন ওদের কাছে। চিৎকার করে বললেন, "থামো, থামো! ওকে মেরো না!"

জ্যাক চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল কাকাবাবুকে। তারপর বলল, "এই আর একটা শয়তান! ধর এটাকেও!"

কাকাবাবুকে দেখে বুড়ো-রাজা শান্তভাবে বললেন, "আমি কিছুতেই ইংরেজের হাতে মরব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তোমার জন্য সেই অপমানের মৃত্যুই আমাকে মরতে হচ্ছে। তুমিও মরবে!"

কাকাবাবু ল্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে একজন জারোয়া আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় আমি এসে তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম, ঠিক কিনা? তুমি এই বুড়ো রাজাকে ছেড়ে দাও!"

ল্যারি তাকাল জ্যাকের দিকে। জ্যাক বলল, "এই দুটো বুড়োকেই আগুনের মধ্যে ফেলে দাও! নইলে আমরা পালাবার সময় এরা আমাদের পেছনে জারোয়াদের লেলিয়ে দেবে।"

ল্যারি তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাক ধমক দিয়ে বলল, "দেরি করছ কী? দাও, ফেলে দাও!"

সঙ্গে সঙ্গে আকাশে একটা প্রচণ্ড ঘট্ ঘট্ শব্দ শোনা গেল। দূর থেকে শব্দটা এগিয়ে এল খুব কাছে। সবাই চমকে ওপরে তাকাল। একটা হেলিকপটার!

ল্যারি বলল, "জ্যাক, শিগগির পালাও! হেলিকপটার নিয়ে পুলিশ এসেছে!

হেলিকপটার দেখে সন্তুরও মনে হল, নিশ্চয়ই তাদের উদ্ধার করার জন্যই ওটা এসেছে। আর কোনো চিন্তা নেই। সে উঠে সোজা হয়ে বসল।

জ্যাক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "একটা মোটে হেলিকপটার এসেছে, তাতে ভয় পাবার কী আছে? আমি এই মেশিনগান দিয়ে ওটাকে ফুঁড়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। তোমরা সরে দাঁড়াও, কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়ো!"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু—"

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু তাকে কী করতে বলছেন। হেলিকপটারটা নীচের দিকে নেমে আসছে। আর একটু নীচে নামলেই জ্যাক গুলি চালাবে। তাদের সব আশা শেষ হয়ে যাবে।

সন্তুর খুব কাছেই পড়ে আছে কাকাবাবুর রিভলবারটা। সে সেটা চট করে তুলে নিল। কোনো চিন্তা না করেই সে দুটো গুলি চালিয়ে দিল জ্যাকের দিকে। গুলির শব্দে তার নিজেরই কানে তালা লেগে গেল, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল হাতে। সে চোখ বুজে ফেলল ভয়ে।

আবার চোখ খুলে দেখল, জ্যাক মাটিতে পড়ে গেছে, আর কাকাবাবু মেশিনগানটা তার হাত থেকে তুলে নিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর কাকাবাবু সেটা বাকি সাহেবদের দিকে ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা সব চুপ করে সারি বেঁধে দাঁড়াও। কেউ একটু নড়বার চেষ্টা করলেই গুলি চালিয়ে শেষ করে দেব—"

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

সুতপা ভট্টাচার্য

ড়, র-এর ছড়া

মাগো, আজকে মানা পড়া
আজ ছুটির পোশাক পরা
দ্বারে কে দেয় নাড়া কড়া
আমার হয়নি তো সাজ করা

আজ পথ-বিপথে ঘুরি
যেন লাটাই-ছেঁড়া ঘুড়ি
যেন পাখাল ঘোড়া ওড়ে
কার সাধ্যি থামায় ওরে

আমি দেবই না তো সাড়া
ঘরে হোক না ডেকে সারা
আমি চলেই যেতে পারি
দিয়ে অকূল সাগর পাড়ি

যদি আঁধার হানে ঝড়ে
যদি বৃষ্টি অঝোর ঝরে
যদি জোয়ারে জল বাড়ে
নাহয় ডুববো একে বারে

আবার সাঁতরে অথৈ বারি
জেনো ফিরবো ঠিকই বাড়ি
যার কোলে মানুষ তারি
কোলে ফিরবো তাড়াতাড়ি

টাকী হাউস গভর্নমেণ্ট স্পন্সরড স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

টাকী হাউস গভর্নমেণ্ট স্পন্সর্ড মাল্টিপারপাস (বয়েজ) স্কুল কলকাতার অনেক স্কুলের চেয়েই বয়েসে ছোট। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৬৫ সালের চোঠা মার্চ। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে এই স্কুলটি ছাত্র ও অভিভাবক মহলে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে। এপর্যন্ত মাত্র একবার বাদে বরাবরই পাশের হার শতকরা ১০০ হয়েছে। এবং ঐ হার সমস্ত ছাত্রকে পরীক্ষায় বসার জন্যে পাঠানোর পর। প্রতিবার শতকরা ৪০—৫০ জন ছাত্র প্রথম ডিভিশন পায়। আর ওদের মধ্যে সাত আটজন করে বৃত্তি পায়। স্ট্যাণ্ড না করলেও এটাই বা কম কী?

প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই স্কুলের দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক। তাঁর আগে ছিলেন স্বনামধন্য শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ রচনা করে বীরেনবাবুও যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছেন। এঁরা দুজনেই হিন্দু স্কুল থেকে টাকী বয়েজ স্কুলে আসেন।

হিন্দু স্কুল ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে বহু কৃতী ছাত্রের সংগে বীরেনবাবুর পরিচয় আছে। সেইসব ছাত্রকে খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছেন বলেই তাদের লেখাপড়ার ধরনধারণ, উত্তর লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। জিজ্ঞেস করলাম, "ভাল ফল করতে গেলে কতটা পড়াশোনা করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?"

"দেখুন, এ-সম্পর্কে ধরা-বাঁধা কোনো নিয়ম নেই। যে ছেলে খুব ভাল, যার মধ্যে কিছু জিনিস আছে, দিনে মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা পড়েই স্ট্যাণ্ড করে। আবার এও দেখেছি যে, কেউ কেউ ভাল উত্তর অপরের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে সেগুলো দিনে চোদ্দ থেকে ষোল ঘণ্টা ধরে মুখস্থ করে স্ট্যাণ্ড করে। এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি যারা আছে, তারা দিনে আট-দশ ঘণ্টার মত পড়ে। এইটাকেই অ্যাভারেজ বা স্ট্যাণ্ডার্ড বলতে পারেন।"

"ঠিক কীরকম উত্তর পেলে পরীক্ষকরা ভাল নম্বর দেন?"

"উত্তর যথাযথ হওয়া চাই এবং উপস্থাপন ভাল হওয়া দরকার। পয়েণ্টের পারম্পর্য রক্ষা করতে হবে। আর, বানান, হাতের লেখা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও অনেকটা নির্ভর করে। ভাষার উপর ভাল দখল না থাকলে পরীক্ষার হলে বসে ভাল উত্তর লেখা যেতে পারে না। ভাষার গতি হওয়া চাই সাবলীল।"

"কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়টিতে ঐ সাবলীলতা দেখানোর..."

"অবকাশ নেই, এই কথা বলবেন তো? ওটা ভুল ধারণা। বিজ্ঞানেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে, এমনকী অঙ্কের মত বিষয়েরও। সংজ্ঞা জাতীয় প্রশ্নগুলির কথা বাদ দিলে বর্ণনাত্মক উত্তর লিখতে ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এবং নম্বরের পার্থক্য এতে যথেষ্টই হয়। কারণ বিভিন্ন ছাত্রের লেখার স্টাইল আলাদা।

অঙ্ক সম্পর্কে শ্রীভট্টাচার্য বললেন, "আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনে একটা অঙ্কভীতি সৃষ্টি করা হয়। এটা খুব খারাপ। অঙ্কের প্রথম এবং শেষ কথা হচ্ছে অভ্যাস। একই অঙ্ক নানা-ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাল নম্বর পেতে হলে সেগুলি জানতেই হবে। আর অঙ্কের বিভিন্ন চিহ্ন সব ছাত্রেরই নখদর্পণে থাকা উচিত। কারণ একটি চিহ্নের সামান্য এদিক-ওদিক হওয়াতে অনেক গণ্ডগোল হয়ে যায়।"

"আপনার সাবজেক্ট কেমিস্ট্রি সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"ভাল উত্তর লেখা সম্পর্কে যা বলেছি, সেগুলি কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স সব কিছুর সম্পর্কেই প্রযোজ্য। উত্তরের সংগে যেখানে সম্ভব স্কেচ এঁকে দিলে নম্বর বাড়তে বাধ্য। তবে আঁকাটা ভাল হতে হবে এবং ছবিটিতে কোনটা কী বুঝিয়ে দিতে হবে, যাকে বলে লেবেলিং।"

"যেমন, ডিস্টিলেশনের স্কেচে কোনটা কী যন্ত্র তা লিখে দিতে হবে, এই তো?"

একটু হেসে বীরেনবাবু বললেন, "না, যন্ত্রের নাম না লিখলেও চলবে। তবে কোন যন্ত্রের মধ্যে কী আছে, বা খুব বেশি উত্তাপ প্রয়োগ করা হলে, কত ডিগ্রী, এসব লিখে দেওয়া চাই। আর কোনোরকম হিসেব করলে সেটা রাফে দেখানো দরকার। এই সব কথা সাধারণভাবে ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, ভূগোল—সব বিষয় সম্পর্কেই খাটে।"

"ভূগোল আর ইতিহাসের জন্যে আলাদা করে কিছু বলবেন না?"

"ভূগোলে প্রাকৃতিক অংশ ভাল করে না বুঝলে বিষয়টিতেই ভাল নম্বর পাওয়া অসম্ভব বলে আমি মনে করি। ম্যাপ ও স্কেচ দিয়ে উত্তরকে সমৃদ্ধ করার কথা তো বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের উত্তরেও ম্যাপ ও চার্ট দিতে হবে। আর উত্তরের বাঁ ধারে মার্জিনে সংক্ষেপে পয়েণ্টস উল্লেখ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ইতিহাসেও উত্তর হবে ঘনসন্নিবদ্ধ। 'যত লিখবে তত নম্বর'—ইতিহাস সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণাটা একেবারেই

ভুল। ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুতেই 'ওয়ার্ক বুক' ব্যবহার করা খুবই দরকার।"

ইংরেজী সম্পর্কে বীরেনবাবুর বক্তব্য, বেশি বয়েসে ইংরেজী শেখা আরম্ভ করার ফলেই ছাত্ররা বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না। ইংরেজী নির্ভুল লিখতে হবে। টেক্সট বই ভাল করে পড়ে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। উত্তরটা নিজেই সংশোধন করে নিয়ে শিক্ষককে দেখাতে হবে। তারপর আবার লিখতে হবে। আর, নিজে নিজেই প্রশ্ন ঠিক করে তার উত্তর দিতে পারলে খুব ভাল। ওঁদের স্কুলে অনেক সময় কোনও বিষয় নিয়ে একদল ছাত্র প্রশ্ন করে, আর একদল উত্তর দেয়। পদ্ধতিটা কার্যকর বলেই ওঁরা মনে করেন।

ইংরেজী সম্পর্কে সাধারণ ছাত্রদের উচিত খুব ছোট-ছোট বাক্য লিখতে লিখতে বড় এবং আরও বড় বাক্য লিখতে শেখা। ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভাল করে শিখে নিয়ে শব্দভাণ্ডার বাড়াতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রের উচিত কনজুগেশনের একটা চার্ট তৈরি করে পড়ার টেবিলের সামনে টাঙিয়ে রাখা। বানান এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনও লিখে লিখে অভ্যাস করা দরকার।

ভাল নম্বর পেতে হলে মৌখিক পরীক্ষা এবং কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষার বিষয়েও জোর দেওয়া দরকার। কারণ ওখানে অল্প চেষ্টাতেই অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়।

মাসিক আনন্দমেলার "লেখাপড়া" এবং "মজার পড়া" বিভাগ দুটি সম্পর্কে বীরেনবাবু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, পত্রিকাটিকে পাক্ষিক করা উচিত। আর একটি কথা, যেসব ছাত্র প্রথম থেকে দশম স্থান পর্যন্ত অধিকার করেছে, তাদের উত্তরগুলো ছেপে বার করলে কেমন হয়? এতে ছাত্র, শিক্ষক সকলেরই উপকার হবে।

কীভাবে তৈরী হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

বীরেনবাবু আগে না বলে দিলে মনে করে নিতাম ক্লাস সেভেন কি এইটের ছাত্র। ছোটখাট দেখতে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় দীপঙ্কর খান। ছেলেটি বেজায় লাজুক আর মুখচোরা। আমাকে বলেইনি যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রদর্শনীতে ও নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম পুরস্কারও পেয়েছে। দীপঙ্করের বাবা ডঃ রতনমোহন খান গণিতের নামকরা অধ্যাপক। দীপঙ্করের বয়স সাড়ে চোদ্দ বছর।

দীপঙ্কর বরাবর এই স্কুলেই পড়ছে। তবে ক্লাস নাইনের হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার আগে ফার্স্ট হতে পারেনি সেকেন্ড থেকে ফিফথের মধ্যে একটা কিছু হত। দীপঙ্কর বলল, ও সকালে একঘণ্টা পড়ে, আর রাতে পড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ওর খুবই ভাল লাগে। দীপঙ্করের ইচ্ছে, ডাক্তার হবার।

জিজ্ঞেস করলাম, "মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে কীভাবে তৈরি হচ্ছ?"

দীপঙ্কর মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ও একাধিক ভাল বই থেকে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরি করে মাস্টারমশাইদের দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিচ্ছে। পরিমার্জিত উত্তরগুলি ও ভাল করে তৈরি করে, দরকারমত আবার লিখে। ও নিয়মিত ক্লাসে পড়া শোনে এবং শিক্ষকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পায়।

দীপঙ্কর ইংরেজী টেক্সট বই খুব ভাল করে পড়ে, তারপর টেক্সটের বাইরের গ্রামার পড়ে, ট্রানস্লেশনও করে নিয়মিত। স্কুলে পড়ানো হয় ডি সি দত্ত এবং পি কে ভট্টাচার্যের বই। ও তার ওপর পড়ে নেসফিল্ড, পি কে দে-সরকার, টমসন-মার্টিনেট, রেন-মার্টিন। এছাড়া ই এল বি এস-এর লার্নার'স ইংলিশ ডিক্সনারি ব্যবহার করে। নিয়মিত টেস্ট পেপার্স সমাধান করে। ইংরেজীর মত বাংলাতেও স্কুলের ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের রচনা-বই ছাড়া বাইরের বামনদেব চক্রবর্তী ও মদনমোহন বিদ্যাভূষণের বই পড়ে।

ডঃ খান দীপঙ্করকে যে খুব বেশি সময় দিতে পারেন, তা নয়; তবে অঙ্কটাই বুঝিয়ে দেন বেশি করে। তাঁর বই দীপঙ্কর তো পড়েই, তা ছাড়া পড়ে কে পি বসু ও কেশবচন্দ্র নাগ। মাঝেমধ্যে দাশ-মুখার্জীর বইও বাবার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসে পড়ে। ভৌতবিজ্ঞানে স্কুলে চিত্ত মিত্র ও দুর্গাদাস বসুর বই পড়ানো হয়। দীপঙ্কর এর বাইরে অনেক বই পড়ে— পি কে দত্ত, ল্যাডলি মিত্র কেমিস্ট্রিতে, আর ফিজিক্সে সি আর দাশগুপ্ত, তপেন রায়, অলক মজুমদার। জীবনবিজ্ঞানেও সেই-রকম। ক্লাসে পড়ানো হয় সরকার ও বসাকের বই। ও আরও পড়ে মুখার্জী-মুখার্জী, কুণ্ডু-দাস-কুণ্ডু আর তারকমোহন দাস। ভূগোলে লোকেশ চক্রবর্তী, স্পেট, ডাডলি স্ট্যাম্প। স্কুলে পড়ানো হয় গৃহ-শ্যামের বই।

কি ভূগোল, কি ইতিহাস, দীপঙ্কর ম্যাপ এবং ওয়ার্কবুক ছাড়া কোনো সময়েই পড়ে না। ইতিহাসে ডঃ দিলীপ ঘোষের বই বুকলিস্টে দেওয়া আছে, ডঃ কিরণ চৌধুরীর বইও আছে রেফারেন্স হিসাবে। দীপঙ্কর এ দুটি বই ভাল করে পড়ে। পেঙ্গুইন সিরিজে ভারতীয় ইতিহাসের উপর যে দু'খণ্ডের বইটি আছে, সেটিও পড়ে।

আনন্দমেলার "লেখাপড়া" ও "মজার পড়া" বিভাগ দুটি দীপঙ্করের খুব ভাল লাগে। ও দুটি বিভাগ থেকে ও অনেক উপকৃত হয়েছে।

মডেল ও চার্ট তৈরি করা দীপঙ্করের সবচেয়ে প্রিয় হলেও বিজ্ঞানবিষয়ক গল্প লেখা, ছবি আঁকা এবং একটু-আধটু ফুটবল খেলাও ওর ভাল লাগে। ভাল লাগে গল্প, উপন্যাস, কবিতা পড়তেও। ও আশা করে যে, পরীক্ষায় ওর ফল ভাল হবে।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

সমে শমে বিষম ব্যাপার

কুম্ভক

একটা পিরামিড এঁকে দেবে দাদা?

নিজে আঁকো না।

কী করে আঁকব বুঝতে পারছি না।

দূর, ও তো খুব সোজা। প্রথমে একটা ত্রিভুজ এঁকে দে।

ত্রিভুজ?

হ্যাঁ, ত্রিভুজ। সমবাহু হলেই দেখতে ভালো হবে।

সমবাহু আবার কী?

জানিস না? —মহোৎসাহে নন্তু তখন জ্যামিতি বোঝাতে বসল টুম্পিকে। খাতায় ছবি এঁকে দেখাল ঃ এই দেখ্, তিনটে দিকই সমান, সমবাহু। দুটো দিক সমান, সমদ্বিবাহু। আর, সবকটা অসমান, এই হলো বিষমবাহু।

ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করল নন্তু ঃ কী রে, ঢুকছে মাথায়?

ঢুকছে তো, কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

কী কথা?

তুমি সম লিখলে, অসম লিখলে, তাহলে বিসম না লিখে বিষম লিখছ কেন?

অমনি একটা বিষম খেল নন্তু। বলল ঃ হায়, কাকুর ভূত চেপেছে তোর মাথায়।

ওই যে এসে গেছে কাকু। অনেকদিন বাঁচবে তুমি। বলো তো কাকু, সম বা অসম-র বেলায় দন্ত্য স, বিষম-এ তবে মূর্ধন্য ষ কেন? বলো দেখি তোমার নিয়ম।

এবার একটু জব্দ করেছিস। খুব যে একটা নিয়ম আছে তা বলা শক্ত, একেবারে যে নেই তাও নয়। তবে থাকে যদি কিছু, সেটা তোদেরই বার করতে হবে খুঁজে। দেখি একটু খাতাটা—

খাতা টেনে নিয়ে বড়ো বড়ো করে লিখি—

সম	বিষম
অসহ	দুর্বিষহ
স্থান	প্রতিষ্ঠান
স্নাত	নিষ্ণাত
যশস্কাম	নিষ্কাম
সঙ্গ	অনুষঙ্গ
সুপ্তি	সুষুপ্তি

জিজ্ঞেস করি—এই শব্দগুলির দিকে তাকিয়ে বল্ তো, স-এর ষ হবার কোনো কারণ পাওয়া যায় কিনা।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করে টুম্পি বলে—সবকটার মধ্যে একটা মিল কিন্তু আছে।

কী রকম মিল?

সবকটা ষ-এর আগেই দেখছি ই-কার বা উ-কার আছে।

ঠিক। যদি অ বা আ থাকত, স-টা আর পালটাত না তবে। যেমন ধর্, অসম, প্রসঙ্গ, আসঙ্গ—

কিন্তু নিঃসঙ্গ? দুঃসহ? তার বেলা? —নতুন করে আবার ধাঁধায় ফেলে নন্তু।

বা রে, ওটা কি ই-এর পরে উ-এর পরে হলো না কি? ওটা না বিসর্গের পরে?

গুড, ভেরি গুড। ঠিক বলেছিস টুম্পি। কিন্তু তাহলে কেন বলছি যে খুব-একটা নিয়ম নেই? বললেই তো হয়, উপসর্গের শেষে ই বা উ থাকলে তার পরের স-টা ষ হয়ে যায়।

বললেই তো হয়। বলছ না কেন?

কী করে বলব? হয় না যে সব সময়ে। অনেকগুলি শব্দে হয়, অনেকগুলির বেলা হয় না। অসংগত বললে যেমন স চাই, বিসংগত বললেও ঠিক তাই। বিবাদ-বিসংবাদের বেলায় কী হবে? বিসর্পিত? তবু ই উ-এর প্রভাবের কথাটা মনে রাখা ভাল। তাহলে হয়তো ঠিক থাকবে পুরস্কার, তিরস্কার, অন্যদিকে পরিষ্কার বহিষ্কার বা এমন-কী পুষ্করিণী।

নন্তু বলল ঃ যাক, এরা একটু ভালোমানুষ তবু। নিজেদের মধ্যে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ নয়। যার যার তার তার নয়।

তা কিন্তু বলা যায় না নন্তু। যার যার তার তার ব্যাপারে এরাও কম ওস্তাদ নয়। বললাম না সেদিন? ত বা থ-এর সঙ্গে কখনোই বসবে না ষ, তাই দুস্তর থেকে নিস্তার নেই। ট বা ঠ-এর সঙ্গে চলবে না স।

মানি না, মানি না, মানি না। আমি দেখেছি ভাল ভাল লেখকদের স্টেশন লিখতে, ব্যারিস্টার বা স্ট্রীট লিখতে। মানি না তোমার নিয়ম।

আরে দাঁড়া, দেখেছিস তো ঠিকই। কিন্তু লক্ষ করেছিস তো, যে-তিনটে শব্দ বললি, তিনটেই অন্য ভাষা থেকে নেওয়া শব্দ। আমাদের নিয়মটা তো কেবল সংস্কৃত শব্দের বেলায়, তৎসম শব্দে।

টুম্পি বলে ঃ এই যে আবার ফিরে এসেছে সম। তৎসম।

এবার তাহলে প্রশমিত হোক সব উত্তেজনা।

ওটা আবার কোন্ স কাকু?

এ একেবারে অন্য ব্যাপার। এ হলো শম। এর মানেই আলাদা। ইনি এলে শান্তি নেমে আসে।

তাই নাকি? —বিধিমতো হাতের মুদ্রা তুলে উচ্চারণ করল নন্তু ঃ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চন্দ্রভানুর রাজ্যলাভ

রমানাথ রায়

একদিন এক সুদর্শন সন্ন্যাসী এসে রাজা চন্দ্রভানুকে বললেন, "মহারাজ, সবই অনিত্য, আজ আছে, কাল নেই।"

তারপর থেকে চন্দ্রভানুর আর মন ভাল নেই। সব সময় মুখ ভার করে থাকেন। থেকে-থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কোনও কাজেই তাঁর মন বসে না।

একদিন চন্দ্রভানুর এক প্রিয় সখা এসে বললেন, "মহারাজ, চলুন, মৃগয়া করে আসি।"

চন্দ্রভানু উত্তর দিলেন, "কী হবে মৃগয়া করে?"

"একথা বলছেন কেন মহারাজ?"

চন্দ্রভানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই অনিত্য, আজ আছে কাল নেই।"

প্রিয় সখা মুখ ম্লান করে চলে গেলেন।

একদিন প্রজারা কাঁদতে কাঁদতে রাজসভায় এসে উপস্থিত হল।

"মহারাজ!"

"বলো।"

"এবারের খাজনা মকুব করতে হবে।"

"কেন?"

"ক্ষেতে ফসল হয়নি।"

চন্দ্রভানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই অনিত্য, আজ আছে কাল নেই।"

প্রজারা তা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেল।

একদিন মন্ত্রী এসে নিবেদন করলেন, "মহারাজ, ভীষণ বিপদ।"

চন্দ্রভানু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"পশ্চিম থেকে রাজা বিক্রমসিংহ হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের রাজ্যের দিকে এগিয়ে আসছেন।"

চন্দ্রভানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই অনিত্য, আজ আছে কাল নেই।"

মন্ত্রী তা শুনে বিষণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন।

আস্তে-আস্তে রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মন্ত্রী কী করবেন না করবেন তা ভেবে না-পেয়ে দাবা খেলতে লাগলেন। সেনাপতি দিনরাত পড়ে-পড়ে ঘুমোতে লাগলেন। রাজ্যে চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেল। প্রজারা ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাতে লাগল। রাত্রে কেউ আর পথে বেরয় না। সন্ধে হলেই সকলে ঘরের দরজায় খিল তুলে দুর্গা নাম জপ করতে থাকল।

চন্দ্রভানুর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখ ভার করে সব সময় বসে থাকেন, শুয়ে থাকেন, মাঝে-মাঝে পায়চারি করেন। কারও কথা শোনেন না। কেউ কিছু বলতে এলেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

এদিকে দেখতে-দেখতে রাজা বিক্রমসিংহ দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হলেন। দাবা ছেড়ে মন্ত্রী হায় হায় করে উঠলেন। রাজাকে কয়েকবার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চন্দ্রভানু কিছু বুঝলেন না। সেনাপতি যথারীতি ঘুমোতে লাগলেন।

বিক্রমসিংহ সহজেই চন্দ্রভানুর রাজ্য জয় করে নিলেন।

চন্দ্রভানু রাজ্যচ্যুত হয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। সঙ্গে রইলেন শুধু মন্ত্রী। এই ঘোর বিপদে তিনি রাজাকে একা ছেড়ে দিতে পারলেন না।

পালাতে-পালাতে চন্দ্রভানু ও মন্ত্রী এক গভীর বনের

মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। চন্দ্রভানুর এত পথ হাঁটার অভ্যেস নেই। চিরকাল তিনি হাতির পিঠে চেপে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটা গাছের নীচে চিং হয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুম এল না। মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "মন্ত্রী!"

মন্ত্রী হাঁপাচ্ছিলেন। বসে উত্তর দিলেন, "বলুন মহারাজ!"

"আমার ঘুম আসছে না কেন?"

"আপনার মাটিতে শোয়ার অভ্যেস নেই, তাই।"

"তুমি একটা বিছানা আনতে পারো?"

"এই বনে কোথায় বিছানা পাব মহারাজ?"

"একটা মাথার বালিশ? নাকি, তাও আনতে পারবে না?"

"না মহারাজ, তাও আনতে পারব না।"

"তুমি একটা অপদার্থ।"

মন্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। চন্দ্রভানু আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবারেও তাঁর ঘুম এল না। তিনি চুপচাপ শুয়ে রইলেন। একটু পরে তাঁর পেট চোঁচোঁ করতে লাগল।

"মন্ত্রী!"

"বলুন মহারাজ!"

"আমার খিদে পেয়েছে।"

"তার জন্যে কী করতে পারি মহরাজ?"

"সামান্য পোলাও আর মাংসের ব্যবস্থা করতে পারো?"

"এখানে ওসব পাবেন না মহারাজ।"

"এখানে কী পাওয়া যাবে?"

"এখানে শুধু ফলমূল পাওয়া যাবে।"

"তুমি একটা অপদার্থ।"

মন্ত্রী এবারেও কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। চারদিকে গভীর জঙ্গল। থেকে থেকে পাখির ডাক, বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। চন্দ্রভানু একসময় ভীত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "মন্ত্রী!"

"বলুন মহারাজ!"

"এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে চলো।"

"কেন?"

"আমার খুব ভয় করছে।"

"কিন্তু এখন তো বেরোন যাবে না।"

"কেন?"

"চারদিকে বিক্রমসিংহের সৈন্য। আমাদের দেখতে পেলেই শূলে চড়াবে।"

"এত সাহস! আমিও দুদিন আগে রাজা ছিলাম।"

মন্ত্রী হাসলেন. "সবই অনিত্য, আজ আছে কাল নেই।"

রাজা এবার রেগে গেলেন। "তুমি ঠাট্টা করছ!"

"আমার সে সাহস নেই মহারাজ।"

"এখন উপায় কী বলো?"

"আবার রাজ্য অধিকার করতে হবে।"

"কীভাবে? আমার তো কোন সৈন্য নেই। সবাই পালিয়েছে।"

মন্ত্রী একটু ভেবে বললেন, "আপনি এখন আপনার ভগ্নীপতি রাজা ইন্দ্রজিতের সাহায্য নিন।"

চন্দ্রভানু খুব খুশী হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ মন্ত্রী। কিন্তু বিক্রমসিংহ যে অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তার কয়েক লক্ষ সৈন্য আছে।"

"আপনারও তো ছিল। তবু হারলেন কেন?"

চন্দ্রভানু কোন উত্তর না দিতে পেরে চুপ করে রইলেন। তারপর কদিন ধরে পাখির ডাক শুনলেন। বাঘের গর্জন শুনলেন। মশার কামড় সহ্য করলেন। সেই সঙ্গে বনের ফল খেতে লাগলেন। নদীর জল খেতে লাগলেন। আর গাছের ডালে মাচা করে ঘুমোতে লাগলেন।

একদিন থাকতে না-পেরে চন্দ্রভানু মন্ত্রীকে বললেন, "এবার বেরোন যাক। নাকি এখনও চারদিকে বিক্রমসিংহের সৈন্য মোতায়েন আছে?"

মন্ত্রী হেসে বললেন, "আমাদের আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

"কেন?"

"আমাদের গোঁফদাড়ি বেশ ভালমত গজানো দরকার।"

"এতে লাভ?

"ছদ্মবেশটা তাহলে পাকা হয়।"

চন্দ্রভানু মন্ত্রীর কথা মেনে নিলেন। বনের ফল আর নদীর জল খেয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। আস্তে-আস্তে তাঁর মুখ এবং মন্ত্রীর মুখ গোঁফদাড়িতে ঢেকে গেল।

মন্ত্রী তখন বললেন, "মহারাজ। এবার আমরা এখান থেকে বেরোতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাদের পোশাকটাও বদলে নেওয়া দরকার।"

"এখানে অন্য পোশাক কোথায় পাব?"

বনের মধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকতেন। মন্ত্রী তাঁদের কাছ থেকে দুটো কাপড় চেয়ে আনলেন। রাজা ও মন্ত্রী নিজেদের পোশাক ছেড়ে সন্ন্যাসীদের কাপড় পরে বন থেকে বেরোলেন। তাঁদের কেউ চিনতে পারল না। তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ইন্দ্রজিতের রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

ইন্দ্রজিৎ তাঁর শ্যালকের দুঃসংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। তিনি শ্যালককে আর তাঁর মন্ত্রীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। চন্দ্রভানু ও মন্ত্রী গোঁফদাড়ি কামিয়ে স্নান করে খেতে বসলেন। দীর্ঘদিন পরে চন্দ্রভানু পোলাও আর মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। তারপর নরম বিছানায় এক ঘুম দিয়ে মন্ত্রী ও ভগ্নী-পতির সঙ্গে রাজ্য উদ্ধারের জন্যে নানা পরামর্শ করতে লাগলেন।

এক সময় মন্ত্রী চন্দ্রভানুকে বললেন, "কিছু ভাববেন না মহারাজ। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

চন্দ্রভানু জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে?"

মন্ত্রী এর উত্তর না দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে বললেন, "আপনি আমাকে একজন সুদর্শন বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী জোগাড় করে দিন।"

সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী জোগাড় করতে দেরি হল না। কদিনের মধ্যেই তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মন্ত্রী তাঁকে বললেন, "সন্ন্যাসী! আপনাকে বিক্রমসিংহের কাছে যেতে হবে।"

সন্ন্যাসী ধীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

"সেখানে গিয়ে রাজাকে একটা কথা বলতে হবে।"

"কী কথা?"

"রাজাকে বলবেন, মহারাজা! সবই অনিত্য, আজ আছে কাল নেই।"

সন্ন্যাসী সঙ্গে-সঙ্গে বিক্রমসিংহের কাছে উপস্থিত হয়ে কথাটা বলে চলে এলেন।

মন্ত্রী সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, "কথাটা বলার সময় রাজার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন?"

"তাকিয়েছিলাম।"

"কী দেখলেন?"

"কথাটা শুনে রাজা যেন চমকে উঠলেন।"

মন্ত্রী তা শুনে হাসলেন। তারপর সন্ন্যাসীকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বিদায় করলেন। সন্ন্যাসী খুব খুশী হয়ে চলে গেলেন।

দিন যায়। চন্দ্রভানু থেকে-থেকে অস্থির হয়ে পড়েন। রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারেন না একদিন আর থাকতে না পেরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "মন্ত্রী!"

"বলুন মহারাজ।"

"আর কতদিন আমি অপেক্ষা করব?"

"আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে মহারাজ!"

"কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, মহারাজ।"

চন্দ্রভানু আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। চুপ করে রইলেন।

কয়েক মাস পরে মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎকে বললেন, "একটা চর পাঠাতে হবে।"

"কোথায়?"

"বিক্রমসিংহের রাজ্যে।"

সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর কথামত বিক্রমসিংহের রাজ্যে চর পাঠানো হল। চর ফিরে এলে মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখলে?"

"দেখলাম রাজ্যের খুব শোচনীয় অবস্থা।"

"কী রকম?"

"বিক্রমসিংহ নাকি রাজকার্য পরিত্যাগ করেছেন। তিনি চুপ-চাপ বসে থাকেন, শুয়ে থাকেন, মাঝে-মাঝে পায়চারি করেন। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কেউ কিছু বলতে গেলেই বলে ওঠেন, সবই অনিত্য, আজ আছে কাল নেই।"

"মন্ত্রীর কথা কী শুনলে?"

"মন্ত্রী দিনরাত দাবা খেলেন।"

"সেনাপতির কথা কী শুনলে?"

"সেনাপতি সারাদিন পড়ে-পড়ে ঘুমোন।"

"প্রজাদের অবস্থা কী দেখলে?"

প্রজাদের অবস্থা ভীষণ খারাপ। তারা ভাল করে খেতে পায় না। আবার এই অবস্থায় রাজ্যে চোর-ডাকাতের খুব উৎপাত। সন্ধে হলেই প্রজারা চোর-ডাকাতের ভয়ে ঘরের মধ্যে দরজায় খিল তুলে দুর্গানাম জপ করে। কেউ মরে গেলেও পথে বেরোয় না।"

—মন্ত্রী আর-কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। চরকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিদায় করলেন। চর খুশী হয়ে চলে গেল।

তারপর একদিন মন্ত্রীর পরামর্শে চন্দ্রভানু মাত্র কয়েকশো সৈন্য নিয়ে বিক্রমসিংহকে আক্রমণ করলেন। বিক্রমসিংহের কয়েক লক্ষ সৈন্য ছিল। কিন্তু তারা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এমন ফুলে গিয়েছিল যে, আর যুদ্ধ করতে পারল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। বিক্রমসিংহ পরাজিত হয়ে কোনদিকে গেলেন তা কেউ বলতে পারল না।

চন্দ্রভানু আবার সিংহাসন ফিরে পেলেন। পেয়ে মন্ত্রীর বেতন দ্বিগুণ করে প্রবল প্রতাপে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। রাজ্যে আবার সুখ শান্তি ফিরে এল। প্রজারা ধন্য ধন্য করতে লাগল।

ওতো আপনারই মুখ চেয়ে আছে

ছেলেমেয়ে যখন ছোট তখন থেকেই তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সব বাবা-মাই চান। তাদের জন্য পদে পদে বাবা-মার কতনা স্নেহ, যত্ন, উৎকণ্ঠা। আদর-যত্নে ছেলে-মেয়ে মানুষ করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তার চেয়ে বড় কাজ তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আর সে দায়িত্ব আপনাদেরই। মেয়ের বিয়ে বা ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন টাকার। সেই টাকা আজ থেকেই আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে। তবেই তো আপনার দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এর জন্য একটি চমৎকার সঞ্চয়-পরিকল্পনা আমাদের আছে। ৫০০০৲ ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পর আপনি পাবেন ৬০,২৮৫.৬০৲। এর চেয়ে ভালো সঞ্চয়-ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করুন, "ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য যতটা দরকার সবকিছু কি আমি করেছি?"

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস
কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন ঃ ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)
॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

Progressive/UIB-15/75

অমল দত্ত / ছবি তুলেছেন অজিত সোম

প্রদীপ ব্যানার্জি / ছবি তুলেছেন সত্যেন সেন

মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল ?

চিরঞ্জীব

ফুটবলে দলবদলের পালা তো সেই কবে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোন দল কেমন হল?

শুনেছি, মহমেডান স্পোর্টিংও এবার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। হলে ভালই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও জোর হবে। তবে কলকাতা-ফুটবলে দল বলতে এখন দুটিই—মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল। এই দুটি দলের খেলা থাকলে তো দর্শকদের উত্তেজনার সীমা থাকে না। খেলার বাইরেও এদের ঘিরে কম হৈ-চৈ হয় না। দলবদলের সময় (১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ) আনন্দমেলা অফিসের ধারে, আই এফ এ দফতরের এদিক-ওদিক ছিল নানা গুজব। কেউ বললেন, এবার মোহনবাগান আরও শক্তিশালী হল শ্যাম থাপা, সুধীর কর্মকার আর গৌতম সরকারকে ইস্টবেঙ্গল থেকে পেয়ে। "আমরাও পেয়েছি মোহনবাগানের উলাগানাথন ও সমরেশ চৌধুরীকে। আর আছে টগবগে তরুণরা," বললেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা।

সত্যিকারের শক্তিমান কারা? ইস্টবেঙ্গল, না মোহনবাগান? দুই দলের কোচ নিজের দলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। ইস্টবেঙ্গল কোচ অমল দত্ত বলেছেন, "সব কিছু যদি ঠিকমত চলে, যদি পরিচালনা নিখুঁত হয় এবং আই এফ এ তার নিয়মকানুনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করে, তাহলে ইস্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ন হবেই, আই এফ এ শীল্ডও জিতবে।"

মোহনবাগানের কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি জানালেন, "আমার ছেলেরা এবারও চমক সৃষ্টি করবে। লীগ, শীল্ডে তো বটেই, অন্যান্য ট্রফিতেও সমান সফল হবে।"

দুই কোচই নিজ নিজ দল সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার পর ওই কথা বলেছেন।

"আপনার দল কি গতবারের চাইতে দুর্বল হয়ে পড়েছে?" অমলবাবুর জবাব, "না, তবে গতবার সুভাষ ও সমরেশ দল ছেড়েছিল, বাকি সকলে থাকায় সুবিধাও ছিল। এবার বদল বেশি। গতবার অসুবিধাও ছিল। অরিজিনাল লেফট-আউট খেলার মত কেউ ছিল না। কেষ্ট মিত্র ও সুরজিৎ সেনগুপ্তকে দিয়ে ওই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করি, এবার বাঁ প্রান্তে দুর্বলতা নেই। সুরজিৎ তো আছেই, পেলাম উলাগাকে। দুজনেই জাতীয় দলের। এবার দু প্রান্তই সমান শক্তিশালী। অনেকে শ্যামের চলে যাওয়াটাকে বড় করে দেখছেন। বলছেন, শ্যামের বিকল্প কই? বিকল্প দুজন আছে, যারা আগামী দিনে ওর স্থান নেবে। বিমল দাস পর পর তিনবার ভারতীয় রেল দলে খেলেছে, গতবার ভারতীয় দলের সঙ্গে বিদেশে গিয়েছিল। ১৯৭৫-এ সে কলকাতা লীগে টপ-স্কোরার ছিল। আর একজন মিহির বসু। সে গতবার বি এন আর-এ বেশ খেলে। রেল দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিও খেলেছে। গতির দিক থেকে শ্যাম মন্থর হয়ে আসছিল। এখনকার দ্রুতগতির খেলায় উলাগা, সুরজিৎ, রনজিৎ, বিমল, মিহিরই সবচেয়ে উপযোগী।"

"বিমল ও মিহিরের বড় দলে খেলার নার্ভ আছে কি?"

"ওদের অভিজ্ঞতায় ওই মানসিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্যামল ব্যানার্জি, প্রশান্ত ব্যানার্জি ও চিন্ময় চ্যাটার্জি ছোট দল থেকে এসে একবছরের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল কেমন করে? সোভিয়েটের পাকতাকোর দলের বিরুদ্ধে যে ইস্টবেঙ্গল খেলেছিল, তাদের মধ্যেকার নেই শুধু কেষ্ট। তাছাড়া গত মরশুমে শ্যাম তো ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার ছিল না, ছিল উইংড্রয়াল ফরোয়ার্ড। স্ট্রাইকারের অভিজ্ঞতা রয়েছে বিমল ও মিহিরের। উপরন্তু কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে স্ট্রাইকার বলা যায় না। গোটা দলটাই মাঝে মাঝে এমনভাবে মুভ করতে পারে, যখন তারা

সকলেই স্ট্রাইকিং ফোর্স হয়ে ওঠে।"

অমলবাবু ভাস্কর গাঙ্গুলি সম্পর্কে ভীষণ আশাবাদী। শুধু যুব দলের বিরুদ্ধে নয়, ডুরানডে বি এস এফ-এর বিরুদ্ধেও দারুণ লড়েছিল। জুনিয়র ইন্ডিয়া দলে সে বিশ্বজিৎ দাসকে বিট্ করেই নির্বাচিত হয়েছিল। আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে পাঁচ গোল খাওয়া ভাস্কর আর এখনকার ভাস্করে পার্থক্য অনেক। সে এখন পরিণত। ওরই মত ধৈর্য চিন্ময়ের।

ইস্টবেঙ্গল কোচ হাফ বা ডিফেন্স নিয়ে একটুও চিন্তিত নন। তিনি খুশি এখনকার বেগবান ফুটবলের উপযোগী কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সী ছেলেদের পেয়ে। ইস্টবেঙ্গল তারুণ্যে ভরা দল। বললেন : লীগে, শীল্ডে আমাদের কেউ রুখতে পারবে না। কেননা এবারের লড়াই শক্তি, নৈপুণ্য ও তারুণ্য বনাম সুপ্রতিষ্ঠিত, তারকাখচিত বর্ষীয়ানদের।

এবারের ইস্টবেঙ্গল। গোল : ভাস্কর গাঙ্গুলি, সন্তোষ বসু ও রতন ভট্টাচার্য। ব্যাক : রমেন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্যামল ব্যানারজি, চিন্ময় চ্যাটারজি, সত্যজিৎ মিত্র, বলাই চক্রবর্তী ও শ্যামল ঘোষ (অধিনায়ক)। হাফ : প্রশান্ত ব্যানারজি, রতন দত্ত ও সমরেশ চৌধুরী। ফরোয়ার্ড : বিমল দাস, মিহির বসু, উলগানাথন, জহর দাস, সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও রণজিৎ মুখারজি।

মোহনবাগানের কোচ প্রদীপবাবুকে বললাম, "এবার আপনার দল নিশ্চয়ই আরও শক্তিশালী।" তিনি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সুধীর ও গৌতম আসায় আমার ডিফেন্স ও মিড-ফিল্ড আরও ব্যালানসড। মাঝ মাঠের বল কাড়ার শক্তি বেড়েছে। উলাগা চলে যাওয়ায় সামান্য ক্ষতি হবে। ক্ষতি হবে উইং মুভমেন্টের। এখন মানস, বিদেশ ও শুভংকরের উপর অনেক আশা রাখছি। এরা তিনজন বেসিক উইংগার। সুভাষ, শ্যামেরও উইং-সামর্থ্য আছে।"

"মোহনবাগানে কি বেশি 'তারকা'র সমাবেশ হয়নি?"

"আপাতদৃষ্টিতে বেশি হিরো-র সমস্যা আছে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে আমার বিশ্বাস রয়েছে চিরকাল। তবে এদের কম্বাইন করাই তো কোচের কাজ। বিশ্বময় ফুটবলের শুরুতেই ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সময়ে, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল, শেষ দিনেও থাকবে। তবে আসল বস্তুটি হল, টিম গেম বা টিম ওয়ার্ক। আধুনিক খেলার মেরুদণ্ড এটি। এখানে সব হিরোই হিরোর ভূমিকায় অবতীর্ণ নাও হতে পারেন, কাউকে কাউকে টাইপ চরিত্রে নামতে হতে পারে। আমার কাছে ব্যক্তি বড় নয় সংস্থার চাইতে। তা সে যত বড়ই হোক।"

নিজ দলের তারকাদের কথা তুলে জানালেন, "ফুটবল-অনুরাগীর কাছে যদিও হাবিব সুভাষ সুধীর শ্যামের যৌবন অতিক্রান্ত এবং আন্তর্জাতিক খেলার ক্ষেত্রে আমারও মত প্রায় একই, তবে ভারতীয় ফুটবলের মানের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় ওই তারকারা এখনও বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ।"

প্রদীপ ব্যানারজি নিজ দলের দুর্বলতা সম্পর্কে জানালেন, "উইংগার বলতে ভারতে এখন তিনজন—সুরজিৎ, লতিফুদ্দীন ও উলগানাথন। এদের কেউ মোহনবাগানে নেই। তবে সুভাষ ও শ্যামকে যে কোনো উইং দিয়ে দরকারমত কাজ চালানো যায়। অবশ্য ১৯৭২ ও ১৯৭৩এ যে ফুটবল ইসটবেঙ্গলে খেলেছিলাম, তার কতটুকু পারব বলা মুশকিল, যদিও সেই তারকাদের অনেকেই এখন মোহনবাগানে। ওদের প্রত্যেকের বয়স পাঁচ বছর বেড়েছে। তবে তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। ওরা নিষ্ঠা সহকারে যদি অনুশীলন করে, তাহলে এবারও ময়দানে চমক দেখা যাবে। আসবে ট্রফির পর ট্রফি।"

প্রদীপবাবু অবশ্য ট্রফি প্রাপ্তিকে বড় করে দেখেন না। ইসটবেঙ্গলে থাকাকালে চার বছরে পেয়েছিলেন ১৩টি ট্রফি, গতবার মোহনবাগানে এসে পাঁচটি। বললেন, "ট্রফি জয়টা তো সবসময় খেলার মানের নিরিখ নয়। যে খেলা দেখে খেলোয়াড় ও সমর্থকদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সেই খেলা খেলতে না পারলে ট্রফি জিতেও আমার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়।"

এবারের মোহনবাগান। গোল : বিশ্বজিৎ দাস, শিবাজী ব্যানারজি, (প্রশান্ত মিত্র)। ব্যাক : দিলীপ সরকার, দিলীপ পালিত, সুধীর কর্মকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, কম্পটন দত্ত (শংকর ব্যানারজি)। হাফ : প্রসূন ব্যানারজি, গৌতম সরকার, শ্যামসুন্দর মান্না। ফরোয়ার্ড : সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, আকবর, হাবিব, বিদেশ বসু, মানস ভট্টাচার্য ও শুভংকর সান্যাল।

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুদের মত তোমারও। এই শহরের ভালো মানে তোমারও ভালো,—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

রাজার খেলায় মেয়েরা

পুষ্পেন সরকার

মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেটে বাংলা আবার বিজয়ী হয়েছে। পরপর তিন বছর এই সম্মান পেল বাংলা। প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কোনো রাজ্য হারাতে পারেনি বাংলাকে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সব দিক থেকে বাংলার মেয়েরা এবারেও ছিল সবার সেরা। উইকেটকিপিং, ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং—এই তিন বিভাগেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে বাংলার মেয়েরা।

১৯৭৩ সালে পুনাতে মেয়েদের প্রথম জাতীয় ক্রিকেট তিনটি রাজ্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা যোগ দেয়নি। ১৯৭৩-৭৪ সালে দ্বিতীয় জাতীয় ক্রিকেট হয় বেনারসে। তাড়াহুড়ো করে কোনো রকমে একটা দল গড়ে বাংলার মেয়েরা শক্তি পরীক্ষায় নামে। ক্রিকেট নিয়ে মেয়েদের এই ঝাড়াবাড়ি সেদিন অনেকেই ভাল চোখে দেখেননি! অবজ্ঞা ও উপহাস মাথায় নিয়ে তারা খেলতে যায়। অধিকাংশ স্কুল এবং কিছু কলেজের ছাত্রী নিয়ে গড়া বাংলা ফাইনালে কর্ণাটককে হারিয়ে বিজয়ীর পুরস্কার নিয়ে ফিরে আসে। বোলিংয়ে লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য ও রুনা বসু সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল।

১৯৭৪-৭৫ সালে তৃতীয় জাতীয় ক্রিকেটের আসর বসে ইডেনে। মেয়েরা কী ধরনের ক্রিকেট খেলে দেখতে ইডেনে বেশ দর্শক সমাগম হয়। উত্তর প্রদেশ এবং তামিলনাড়ুকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে বাংলা। শান্তা রঙ্গস্বামী অধিনায়িকা। ভারতেরও অধিনায়িকা সে। ব্যাটে-বলে সমান দক্ষতা শান্তার। দলে অনেক কুশলী খেলোয়াড়। কিন্তু বাংলার মেয়েরা রাজ্যের ক্রিকেট সম্মানকে অমলিন রাখতে প্রাণপণ সংগ্রাম করে। সিরিন কেয়াস (৬৬); বনশ্রী দাস (৪৪ নঃ আঃ) এবং অন্য সকলের সাধ্যমত চেষ্টায় ২১৩ রানের এক বড় ইনিংস গড়ে তারা। এরপর কর্ণাটকের ব্যাটিং। রুনা (৪ রানে ৪ উইঃ), লোপামুদ্রা (৪ রানে ৩ উইঃ) আক্রমণে অসাধারণ হয়ে ওঠে। মাত্র ২৪ রানে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস শেষ। দ্বিতীয় ইনিংসে শান্তা (৩৭) মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু শর্মিলা (২০ রানে ৪ উইঃ) ও রুনা (২৫ রানে ৪ উইঃ) শান্তার দলকে ৫৪ রানের বেশি তুলতে দেয় না।

অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইনডিজ এবং নিউজিল্যান্ডের মেয়ে ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসায় ১৯৭৪-৭৫ ও ১৯৭৫-৭৬ প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে। এবারে ছিল চতুর্থ জাতীয় প্রতিযোগিতা। আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স নিয়ে মোট দশটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল গোরক্ষপুরে। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাকে প্রথম খেলতে হয় মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। গার্গী ব্যানার্জী ৮১ রানে অপরাজিত থাকে। দীপা ভৌমিক (৩০); চন্দনা মুখার্জী (৩০); সন্ধ্যা মজুমদার (২৫) ভাল ব্যাট করায় ৬ উইকেটে বাংলার ২১৯ রান হয়। মোট ৬০ ওভার খেলা চলেছিল। মহারাষ্ট্র করে ১০২ রান।

সেমিফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হরিয়ানা। টসে জিতে বাংলা প্রথম ব্যাট করতে নামে। কেয়া রায় জাতীয় প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম শতরান করে (৮×৪) অবসর নেয়। চন্দনাও পিছিয়ে থাকে না। অনুপ্রাণিত হয়ে খেলে সেও শত রানে পৌঁছয় (৬×৪) এবং কেয়ার মত অবসর নিয়ে দলের অন্যদের খেলার সুযোগ করে দেয়। ৪ উইকেটে ৬০ রানও ওঠে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় চার বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এবার হরিয়ানার ব্যাট করার পালা। শর্মিলা বাঁ হাতে স্পিনের জাদু দেখাতে থাকে। চৈত্রের শুকনো পাতার মত উইকেট ঝরে পড়ে। শর্মিলার বোলিংয়ের গড় হিসাব দাঁড়ায় ৬-৪-৩-৫। ৩০ ওভারের মধ্যে ৪৯ রানে হরিয়ানার সকলে আউট হয়ে যায়। এই অসাধারণ বোলিংয়ের জন্য শর্মিলা প্রতিযোগিতায় সেরা বোলারের পুরস্কার লাভ করে।

ফাইনাল খেলা বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। দু'দিনের খেলা। শোভা পণ্ডিতের মত ব্যাটসম্যান এবং ডায়না ইদুলজীর মত চৌকস খেলোয়াড় রয়েছে বোম্বাই দলে। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে বোম্বাইয়ের শোভা (৭৩) ও ডায়না (৪২) দলের বড় ইনিংস গড়ে ফেলে (২০৮)। এবার বাংলার ব্যাট করার পালা। ১০২ রানে তিনটি উইকেট পড়ে

শ্রীরূপা বসু

কেয়া রায়

চন্দনা মুখার্জী

যায়। অধিনায়িকা শ্রীরূপা ব্যাট হাতে মাঠে নামে। অনেক রান পিছিয়ে তার দল। বিরাট দায়িত্ব তার কাঁধে। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে শ্রীরূপা আটবার সীমানার বাইরে বল পাঠায়। চন্দনা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তার ব্যাটও দাপট দেখায়। নয়টি বাউণ্ডারি মেরে এমন এক উজ্জ্বল ইনিংস (৫৩) খেলে সে যা দেখে প্রতিযোগিতার বিচারকরা চন্দনাকে সেরা ব্যাটসম্যানের সম্মান দেন। চন্দনা আউট হয়ে যায়। বোম্বাইয়ের রান অতিক্রম করতে তখনও কিছু বাকি। শ্রীরূপার দায়িত্ব তখনও শেষ হয়নি। ক্রমে বড় হতে থাকে বাংলার ইনিংস। সমান হয় দু দলের রান। টপকে এগিয়ে যায় বাংলা। জয় করায়ত্ত হবার পর ৬০ রানের এক অতুলনীয় ইনিংস খেলে অধিনায়িকা শ্রীরূপা শেষ ব্যাটসম্যান হিসাবে যখন আউট হয় তখন সারা মাঠে বাংলার পর পর তিন বছর জয়ের আনন্দের বন্যা। বাংলার রান ২১৫।

বাংলার সাফল্যের কারণ কী জানতে চাইলে শ্রীরূপা বলল, 'একটা শক্তিশালী দলে যা কিছু প্রয়োজন সব আমাদের আছে। সন্ধ্যা, কেয়া, চন্দনা, গার্গী ভাল ব্যাট। লোপা ও দীপা ওপেনিং বোলার। শ্যামলী মিঠু ডানহাতি এবং শর্মিলা বাঁহাতি স্পিনার। চন্দনা বিশ্বস্ত উইকেটকিপার। তবে আমাদের আরও বেশি করে অনুশীলন করতে হবে।

ছবি তুলেছেন মনোজিৎ চন্দ

ছবি তুলেছেন অলক মিত্র

ছবি তুলেছেন তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচ টেস্টের অভিজ্ঞতা

সুব্রত সরকার

এই তো সেদিন ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শেষ হল, অথচ এর মধ্যেই মনে হচ্ছে কতদিন হয়ে গেল টোনি গ্রেগের এম সি সি দল এদেশে খেলে গেছে। সামনের সিজনে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা। ক্রিকেট-উৎসাহীদের এখন অস্ট্রেলিয়া সফরের কথাই বেশি করে ভাবা উচিত। সেইসঙ্গে মনে রাখা দরকার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজ খেলার অভিজ্ঞতা।

বাঙ্গালোরে চতুর্থ টেস্ট জিততে পারলেও ভারত যে ইংল্যান্ডের কাছে তিনটি টেস্টে যাচ্ছেতাইভাবে হেরেছে, এটা ভোলা যায় না। গ্রেগের দল ভারতে আসার আগে অনেকে মনে করেছিলেন যে, সিরিজে ভারতেরই জেতবার সম্ভাবনা বেশি।। একথা অবশ্য সত্যি, এম সি সি দলটি তেমন শক্তিশালী ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা ৩-১ ম্যাচে জিতে রাবার পেয়ে গেল। কিন্তু সিরিজের শেষ দুটি খেলায়—অর্থাৎ বাঙ্গালোর আর বম্বে টেস্টে দেখা গেল, ভারতই "বেটার টিম"।

ইংল্যান্ডের সিরিজ জয়ের দুটি প্রধান কারণ হল : তাদের দল সর্ব-প্রকার অবস্থায় খেলার জন্য উপযুক্ত ব্যালেন্সড ছিল; আর তাদের খেলো-য়াড়রা প্রায় সবাই ঠিক সময়-মতন নিজের নিজের কাজ করে গেছেন।

দুটি দলকে মিলিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, গ্রেগের অধিনায়কত্ব প্রথম থেকেই উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিল। ম্যাচ জেতা দরকার, সুতরাং সময়মতন, ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। বেদীর নেতৃত্বে এই ধরনের স্বাচ্ছন্দ্যের, অভাব ছিল। তাছাড়া, তিনি দলের সদস্যদের কাছ থেকে প্রথম তিনটি টেস্টে বিশেষ সাহায্য না পাওয়ায় বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। শেষ টেস্ট ভারত হয়ত জিততে পারত, যদি বেদী সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারতেন। বেদীর নেতৃত্বে সাহসিকতার অভাব ছিল। অবশ্য এ কথাও সত্যি, আমাদের দেশের ক্রিকেট-মহল ঝুঁকি নেবার স্বীকৃতি সব সময় দেয় না।

বোলিংয়ে ভারতের স্পিন-বোলাররা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, তবুও দেশের মাটিতে তাঁরা ভারতকে জেতাতে পারলেন না। দলে স্পিনারদের এক তরফা প্রাধান্য থাকলে বোলিং-এর ব্যালেন্স থাকে না, তাছাড়া, অনেক সময় চন্দ্রশেখর আর বেদী সুনাম অনুযায়ী বল করতে পারেননি। অপরদিকে ইংল্যান্ডের একমাত্র স্পিন-বোলার আণ্ডারউড সারা সিরিজ ধরে অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে বল করেছেন। আর এটাও লক্ষণীয়, আমাদের মন্থর-গতির পিচেতে ইংল্যান্ডের পেস বোলাররা খুবই ভাল বল করেন। স্নিভার পান ছাব্বিশটি উইকেট, উইলিস কুড়িটি, আর ওলড চারটি খেলায় দশটি।

ব্যাটিং-এ ইংল্যান্ডের লাইন-আপ খুব সাধারণ হলেও তারা কোনও দু-একজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে থাকেনি। ভারতের ব্যাটিং অনেকটা নির্ভর করে থাকে গাভাসকার আর বিশ্বনাথের উপর। সিরিজে বিশ্বনাথ খুবই খারাপ ফর্মে ছিলেন, আর মাঝে মাঝে গাভাসকারের মধ্যেও মনোযোগের অভাব দেখা যায়।

দুটি দলের মধ্যে পার্থক্য সবথেকে চোখে পড়ার মত ছিল ফিল্ডিংয়ে। ইদানীং ভারতের এত খারাপ ফিল্ডিং দেখা যায়নি। প্রথম দিকের ফিল্ডিং তো খুবই খারাপ ছিল। ওদিকে, গ্রেগের দলের সঙ্গে সফরকারী ইংরেজ সাংবাদিকরা বলেন, কলকাতা আর মাদ্রাজে ইংল্যান্ড যেমন ফিল্ডিং করেছে, এমন ফিল্ডিং তাঁরা গত বিশ বছরের মধ্যে দেখেননি। অ্যালান নটের উইকেট-কিপিং আমাদের কিরমানির চেয়ে ভাল ছিল।

ভারতের খেলোয়াড়রা গত বারো মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট একটু বেশিই খেলেছিল, এবং খুব সহজে নিউজিল্যান্ডকে হারাবার পরে ইংল্যান্ডের মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না আদপেই।

চতুর্থ টেস্টের আগে ভারত বুঝতেই পারেনি যে, ইংল্যান্ড দল কী করে অত ভাল খেলছে! শেষকালে যখন বুঝল যে, আমাদের ব্যর্থতাই ওদের সাফল্যের মূল কারণ, তখন খেলার চেহারা পালটাল। কিন্তু, তখন তো ইংল্যান্ড রাবার জিতে নিয়েছে!

বংশী–ইডেন পিচের কারিগর

চিত্ত বিশ্বাস

কলকাতায় টেস্ট ক্রিকেট তো বটেই, বড় কোনো ক্রিকেট ম্যাচ এলে সাংবাদিকদের মত অন্যরাও ছুটে যেতেন সবার আগে যে মানুষটির কাছে, আর কোনোদিন তাঁর সদা-হাস্যময় মুখটি দেখা যাবে না। ইডেন-পিচের সুদীর্ঘকালের কারিগর কটকের (ওড়িশা) পটমুণ্ডি থানার অন্তর্গত হলধরপুর গ্রামের বংশীধর মহান্তি ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

বাড়ি কটকে হলেও কলকাতারই মানুষ হয়ে গেছিলেন বংশী। এখানে এসেছিলেন ১৯৩৩ সালে। মাঠ তৈরির কাজে হাত দেন তখনকার দুর্ধর্ষ ক্যালকাটা ক্লাবে। পরের বছর ওই ক্লাবের গ্রাউন্ড সেক্রেটারি রোজ্-সাহেব বংশীকে ইডেনে নিয়ে আসেন। ইডেনে চাকরির কয়েক বছরের মধ্যেই বংশী হেড মালী হলেও পিচ বানাতে আরম্ভ করেন ১৯৪০ থেকে। তার আগে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের গ্রাউন্ড সেক্রেটারি ডবলিউ এ ইসকাটের হাতে পিচ বানানোর কাজ পুরো শিখে নেন। তখন থেকে গত জানুয়ারিতে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট পর্যন্ত একটানা বংশী ইডেন-পিচের সর্বেসর্বা ছিলেন। সি এ বি-র গ্রাউন্ড সাব-কমিটিতে অনেক কেষ্ট-বিষ্টুর নাম থাকলেও আসল কাজটি করতে হত ওঁকেই। বছরময় মাঠের মেজাজ থাকত তাঁর নখদর্পণে। যত দলই আসুক, আর যিনিই ক্যাপটেন হোন, তাঁরা বংশীকে খুঁজতেন। জেনে নিতেন মাঠের অবস্থা। ইংল্যান্ড, অসট্রেলিয়া, পাকিস্তান, নিউজিল্যানড যেমন, তেমনি ভারতীয় অধিনায়করাও ওঁর কাছে গিয়েছেন। তা বলে বংশী কখনও ওসব নিয়ে গর্ব করতেন না।

ক্রিকেটের নানা গল্প শুনেছি ওঁর কাছে। ইংল্যানড আর অসট্রেলিয়া সম্পর্কে সর্বদাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। বলতেন, 'বোলচালে এম সি সি, কিন্তু খেলা ভাল অসট্রেলিয়ার।' বার বার তুলতেন মনসুর আলি পতৌদির কথা। বলতেন : কেপটেন বাবু অনেক দেখেছি; পতৌদি কেপটেন সবচেয়ে ভাল আছে! দিল, মেজাজ, খেলা—সব মিলিয়ে ভাল। এসব গুণ একসাথে আর কোনো কেপটেনের নাই।

বংশীর দুটি সাধ ছিল। চাইতেন পৌত্র নির্মল কলকাতায় লেখাপড়া করুক, এখানকার বাবুদের কাছে ক্রিকেট শিখুক। আর বলতেন : এখানেই যেন জীবনটা কেটে যায়। পৌত্র খেলোয়াড় হয়নি। কিন্তু এই শহরেই বংশীর জীবনাবসান হল।

ছবি তুলেছেন বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

ক্যানিয়ন

নদী পৃথিবীর সব দেশেই আছে। কিন্তু নদীকে কেন্দ্র করে অনেক সময় অনেক বিস্ময়কর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই রকমই প্রকৃতির একটি আশ্চর্যজনক সৃষ্টি হল উত্তর আমেরিকার কলরেডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। ক্যানিয়নকে বাংলায় গভীর খাত বলা যেতে পারে। সাধারণত পাহাড়ে গভীর নদীখাত দেখা যায়। পাহাড় খুব উঁচু আর ঢালু। ঢালু জায়গায় জলের স্রোত বেশি। পাহাড়ের মাটি শক্ত বলে নদী বেশি চওড়া খাত তৈরি করতে পারে না। কিন্তু স্রোত বেশি বলে নদী নীচের দিকে মাটি কেটে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বৃষ্টি-হীন বা প্রায় বৃষ্টিহীন মালভূমির মধ্যে দিয়ে নদী যখন বয়ে যায় তখন অনেক মাইল জুড়ে যে গভীর খাতের সৃষ্টি হয়, তাকে ইংরেজিতে বলে ক্যানিয়ন। মাইলের পর মাইল ধরে নদী বয়ে যায় অনেক নিচু দিয়ে দু পাশে থাকে এবড়ো-খেবড়ো মালভূমি। উত্তর আমেরিকার বৃষ্টিহীন পশ্চিমের মালভূমিতে এ রকম অনেক ক্যানিয়ন আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটা রাজ্যের সান জুয়ান নদীতেও ক্যানিয়ন আছে। কিন্তু কলরেডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তুলনাহীন। এইরকম ক্যানিয়ন মরুপ্রায় অঞ্চলেই বেশি দেখা যায় কারণ বৃষ্টির জলে নদীর দুদিকের মাটি নরম হয়ে ধুয়ে যায় না। নদী শুকনো শক্ত মাটি সহজে ক্ষয় করতে পারে না, শুধু তলার দিকে কেটে কেটে গভীরতা বাড়াতে থাকে।

কলরেডো নদী আরিজোনা রাজ্যের উত্তর ভাগে একটি গভীর খাত কেটেছে, এই গভীর খাতটির নামই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এই রাজ্য বৃষ্টিহীন মরুভূমির মতো, সেই জন্যে দুই পাড়ে নদীর ক্ষয় খুব কম। নদীর তলার দিকেই ক্ষয় বেশি। এখানে অজস্র চুড়ো, ঢিবি ও ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি দেখা যায়। এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন চার থেকে আঠারো মাইল চওড়া। সবচেয়ে বেশি গভীরতায় নদী পাড় থেকে এক মাইল পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে। অ্যারিজোনার সীমানা থেকে নেভাডা পর্যন্ত প্রায় ২৮০ মাইল দীর্ঘ এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সবচেয়ে সুন্দর অংশে একটি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক তৈরি করা হয়েছে। সাধারণত এই ক্যানিয়নের রঙ লাল কিন্তু এর প্রত্যেকটা শিলাস্তরেই বিশিষ্ট রঙ আছে, কোথাও হলদেটে, কোথাও ধূসর, কোথাও হালকা-সবুজ এবং কোথাও বা গোলাপী। একেবারে নীচের রঙ চকোলেটের মতো, কোথাও কোথাও বেগুনী বা অন্যান্য রঙও দেখা যায়। প্রতিদিন কলরেডো নদী হাজার হাজার টন কাদা, বালি, নুড়ি ইত্যাদি বহন করে মালভূমির নীচের দিকে নদীখাতে বিপুল ক্ষয়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ছবি তুলেছেন সত্যেন সেন

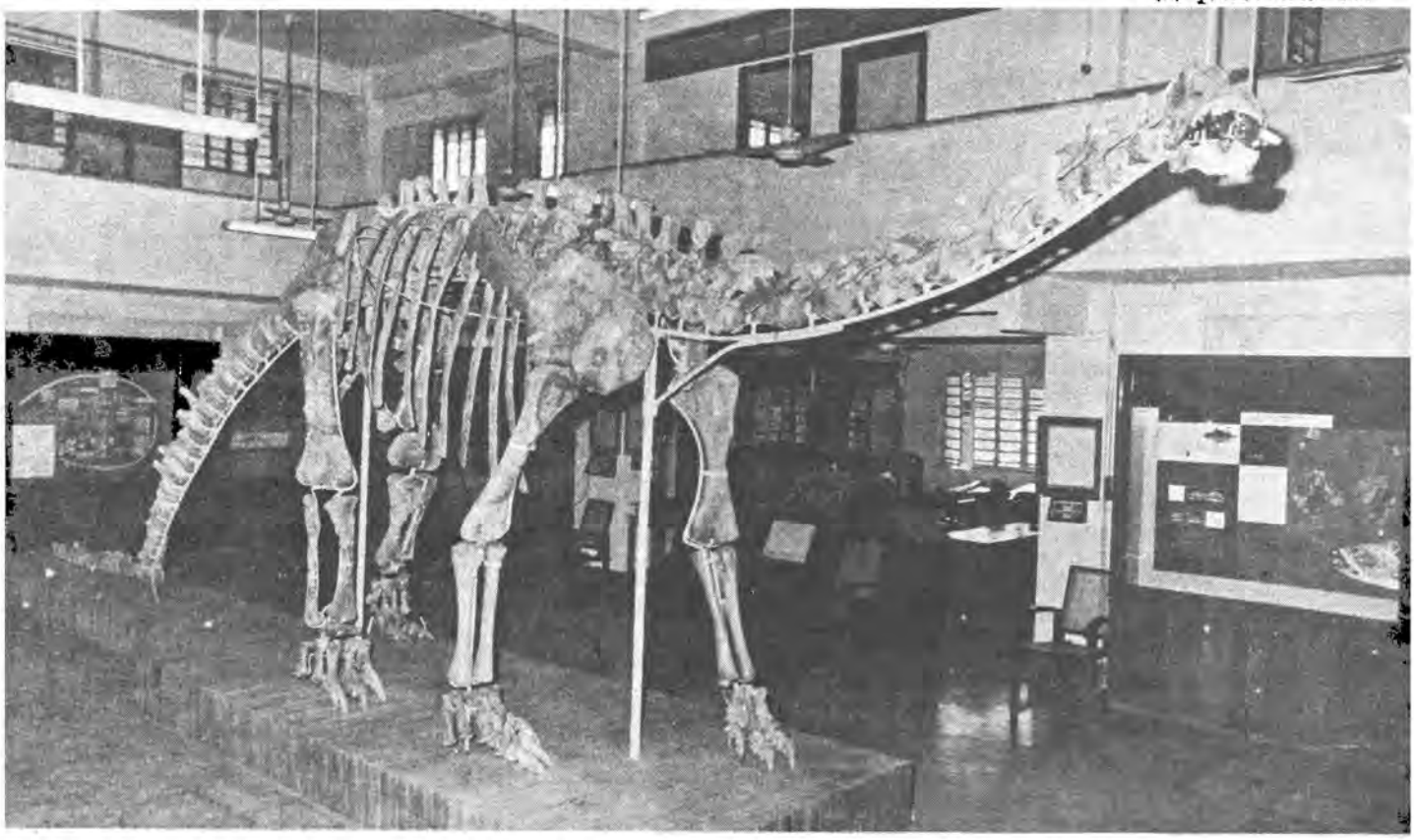

কলকাতায় ডাইনোসর

অসিত পাল

এই সেই ডাইনোসর, যাকে নিয়ে বহু রূপকথা আর লোক-গাথা তৈরি হয়েছে। প্রায় ৪৭ ফুট লম্বা ও দোতলা বাসের সমান উঁচু এই কঙ্কালটি পাওয়া গেছে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে গোদাবরীর উত্তর তীরে। নদীর তীরে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিল বিস্তর হাড়গোড়। জেলের ছেলেরা ওইসব হাড় নিয়ে খেলাধুলো করত। ১৯৫৮ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটির শ্রীমতী পামেলা এল রবিনসনের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টি-টিউট গোদাবরীর তীরে একটি অনুসন্ধানকারীর দল পাঠায়। তাঁরা ডাইনোসরের কঙ্কালটির অংশবিশেষ উদ্ধার করেন। ১৯৬০-৬১ সালে আর-একবার অনুসন্ধানের কাজ চলে। প্রচুর হাড় পাওয়া যায় সেবার। তিন ট্রাক ভর্তি হাড়ের ওজন হবে প্রায় দশ হাজার কিলোগ্রাম। হাড় এল কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে। ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরে শ্রীপ্রণব-কুমার মজুমদার মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে সব হাড় ঠিক-ঠিক সাজিয়ে বিশালাকৃতি ডাইনোসরের কঙ্কালকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। শ্রীমজুমদার মূলত একজন শিল্পী। অনুসন্ধানকারীদের দলে ইনিও ছিলেন। আমেরিকান মিউজিয়ামের প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ব-বিদ ডঃ এডউইন এইচ কোলবার্ট এত অল্প সময়ের মধ্যে কঙ্কালটি জোড়া লাগাতে দেখে অবাক হয়ে যান। এই প্রথম ভারতবর্ষে ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গেল। এর বয়েস হবে প্রায় ষোল কোটি বছর। বিশাল দেখতে হলে কী হবে, ডাইনোসর আসলে ছিল খুব ভিতু প্রকৃতির প্রাণী। মাংস খেত না, খেত শুধু গাছপালা। ডাইনোসরের এই কঙ্কালটির নাম রাখা হয়েছে "বরাপাসোরস টেগোরী"। বরাপাসোরস মানে বড় পা'ওলা গিরগিটি আর টেগোরী রাখা হয়েছে রবীন্দ্র-জন্মশত-বার্ষিকীর সময় এটিকে পাওয়া গিয়েছিল বলে।

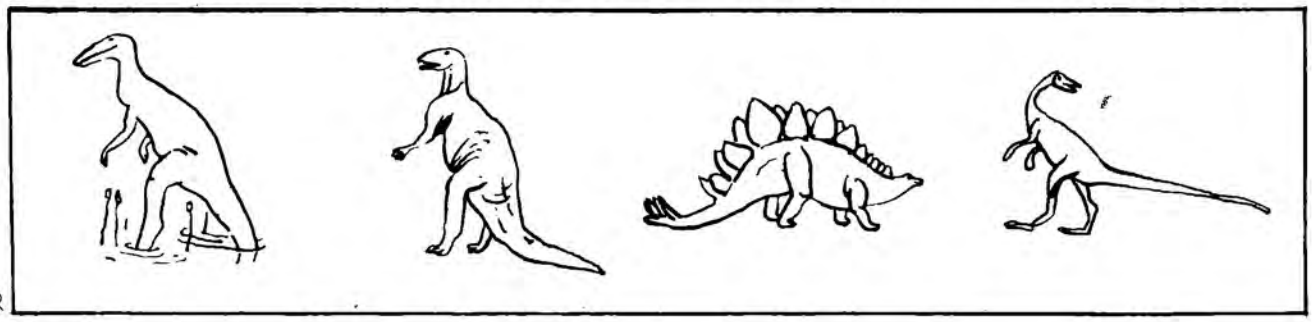

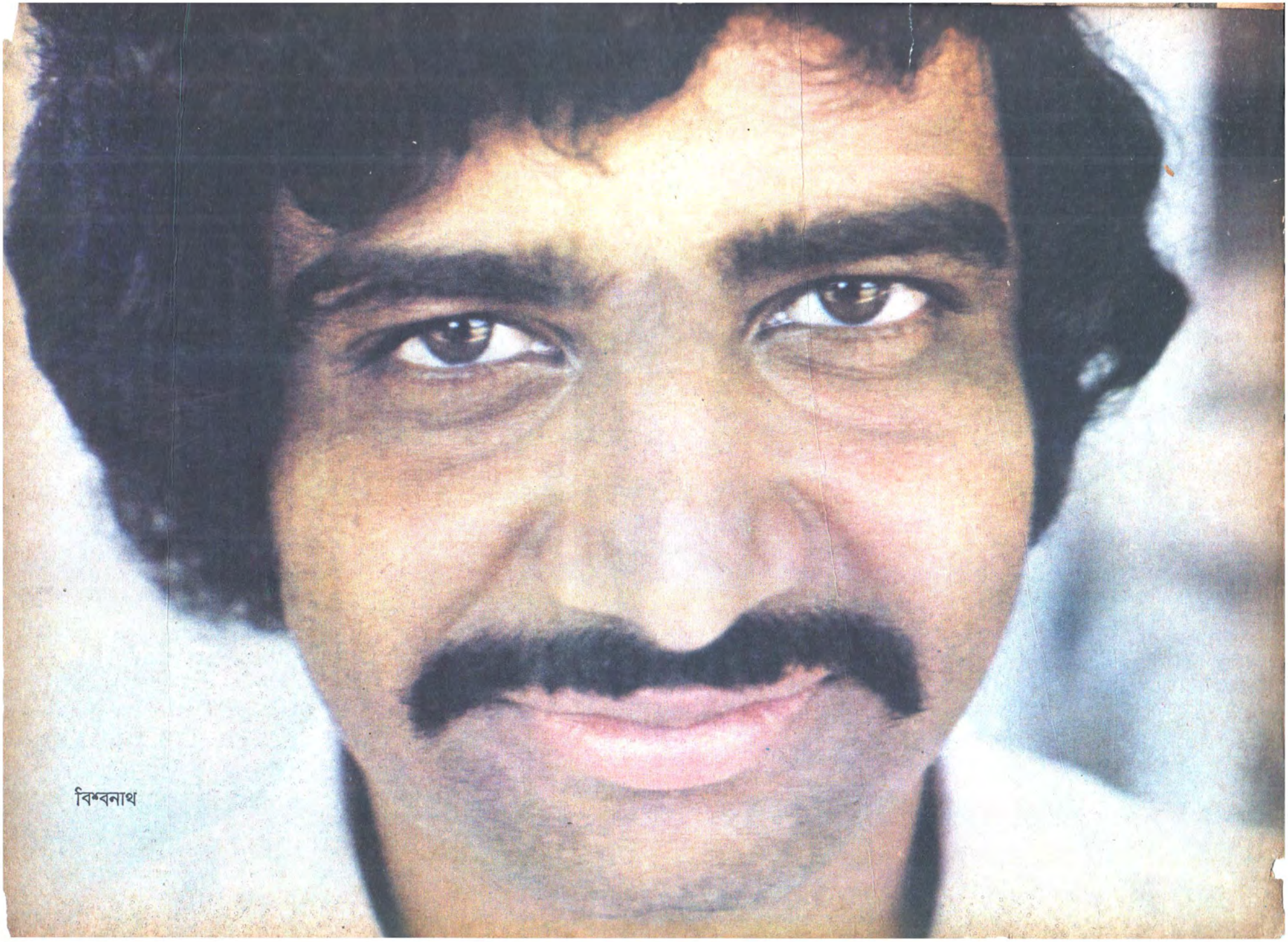

বিশ্বনাথ

রাক্ষস

গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ির পাশের খেলার মাঠটাতে ঝগড়া বেধে গেল সেদিন খুব। অনেক লোক জড় হয়ে গেল। পাড়ার দু-একজন বুড়ো ভদ্রলোকও এসে হাজির হয়েছিলেন। কী যেন বলছিলেন হাত নেড়ে নেড়ে।

জানালার কাছে বসে বসে পিকলু দেখছিল সব। কিন্তু মাথায় ঢুকছিল না কিছুই। কী নিয়ে কন্দড়া? কার সঙ্গে ঝগড়া?

দিদি ঘরে ঢুকেছিল আলমারি খুলে একটা বই নিতে। ইস্কুলে পড়ে। আলমারি আছে নিজের একটা। কাউকে ধরতে দেয় না সেটা।

ও জিজ্ঞেস করল তাকে, "কী হয়েছে রে দিদি?"

"কোথায়?" অবাক হয়ে গেল খুব রানু।

"মাঠে অত ভিড় কেন? হৈ-চৈ কিসের?"

"ও, ওই মাঠটার কথা বলছিস? ওটা তো বিক্রি হয়ে গেছে।" যেন দিদিমণির কাছে পড়া মুখস্থ বলছে মুখখানাকে এমনি করে গড়গড় করে বলে গেল রানু। ভবানীপুরের এক ইঞ্জিনিয়ার কিনেছেন ওটা। মস্ত বড় বাড়ি উঠবে ওখানে। তাই মাপজোক হচ্ছে।

কোন দেশে নাকি একটা নদী আছে। সবাই বলে দুঃখের নদী। দিদিমণি যেমন একদিন বোঝাচ্ছিল দিদিকে, খাটের তলায় বল খুঁজতে গিয়ে ও শুনে ফেলেছিল কথাগুলো, তেমনি দু-এক কথায় সব পরিষ্কার করে দিয়ে রানু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে তাড়াতাড়ি।

মনে মনে কিন্তু পিকলু খুশিই হল একটু। মাঠটা আর থাকছে না তাহলে। তার বদলে মস্ত একটা বাড়ি উঠবে সেখানে। এতদিন মনের মধ্যে যে রাক্ষসটা পুষে রেখেছিল ও, এবার সেটা মিটবে।

পিকলুর ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসে মাঠটাকে। কিন্তু ভয় করছিল খুব। বাবা যদি দেখে ফেলে অমনি নালিশ করবে ডাক্তারবাবুর কাছে। খস্ খস্ করে সাদা কাগজে কী সব হিজিবিজি কাটবে ডাক্তারবাবু। বলবে, এক মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নট নড়ন-চড়ন।

অথচ ওর এই কষ্টের জন্যে মাঠটাই তো দায়ী। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল খুব দুপুরবেলা। কাদা জমে উঠেছিল মাঠে। বিকেলবেলা বল খেলতে নেমে গিয়েছিল ও সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে। গোলের মুখে বলটা পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারেনি। যেই একটু জোরে ছুটে গিয়েছে, অমনি পিছলে গেল পা-টা। তারপর কী যে হল আর কিছু মনে নেই।

চোখ খুলতেই বাবার গলা কানে এল, কেমন, ভেঙেছ তো পা-টা? এখন চুপটি করে শুয়ে থাক বিছানায়। একটুও নড়বে না।

সত্যি সত্যি, কতদিন হয়ে গেল বিছানা থেকে নামতে দেয়নি ওকে। দিদিটা এমন হিংসুটে যে বিছানায় একটু উঠে বসতে দেখলেই মা-কে ডেকে নিয়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গে। বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরলে বাবার কাছে সব কথা লাগাবে। নিজে খুব মজাসে ঘুরে বেড়াতে পারছে কিনা তাই।

একদিন কোলে করে মা বসিয়ে দিয়েছিল ওকে জানালার ধারে একটা টুলের ওপর। বন্ধুরা তখন বল খেলছিল। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। সব রাগ গিয়ে পড়েছিল মাঠটার ওপর। মাঠটা বোধহয় আর জন্মে শত্রু ছিল ওর।

বেশ হয়েছে। মাঠটা খুব জব্দ এখন। পরের ক্ষতি করে যারা, এমনি শাস্তি বুঝি তাদের পেতে হয়।

সেদিন ভোরে টুলের ওপর বসিয়ে দিতেই আবার অবাক হয়ে গেল পিকলু। মাঠটার বুকে বিরাট বিরাট গর্ত করেছে কারা? একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় থাক থাক করে ইঁট সাজানো। কী সুন্দর একটা পাহাড় তৈরি করেছে বালি দিয়ে। বন্ধুরা সবাই একবার করে চড়ছে সেই পাহাড়ে, আবার গড়িয়ে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। বাঃ, ভারি মজার খেলা তো।

না, একটুও দুঃখ হল না ওর মাঠটার জন্যে। পিকলু যেমন পা ভেঙে পড়ে আছে বিছানায়, মাঠটাও তেমনি যন্ত্রণায় ছটফট করুক এখন শুয়ে শুয়ে।

একটু পরেই কালো রঙের একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সেখানে। গাড়ি থেকে নামলেন ফর্সা, লম্বা এক ভদ্রলোক। ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে লাগলেন।

দিদিকে কাছে পেয়ে পিকলু জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কে রে দিদি?"

"উনিই তো ইঞ্জিনিয়ারবাবু। বাড়ির কাজ দেখতে এসেছেন। না দেখলে যে ফাঁকি দেবে মিস্ত্রিরা।" যেন পড়া মুখস্থ হয়েছে কিনা দেখবার জন্য বই বন্ধ করে নিজের মনেই বিড়বিড় করছে সে।

পিকলু আবার বলল, "বাড়িটা কত উঁচু হবে রে?"

"অনে-ক উঁচু। ওই নারকেল গাছটার মাথা ছাড়িয়ে যাবে দেখিস।"

পিকলু ওদের নিজেদের বাড়িটার কথা একবার ভাবতে চেষ্টা করল। ওদের বাড়িতে ছাত আছে কিনা ও জানে না। সিঁড়িটা খুঁজে পায়নি কোনোদিন। উঁচু বাড়ির ছাতে উঠতে একেকদিন খুব ইচ্ছে করে ওর। হাত বাড়িয়ে আকাশটাকে ছোঁয়া যায় কেমন। পাখিগুলো উড়তে উড়তে যখন হাঁফিয়ে পড়বে তখন বসবে এসে ছাতের ওপর। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবে ওকে।

বেশ মজা হবে। মাঠটা থাকবে না তো বয়ে গেল। পা-টা একবার সারুক না। ও উঠবে একদিন নতুন বাড়ির ছাতে। দেখে আসবে সব কিছু নিজের চোখে।

এরপর পিকলু জানালার পাশে বসতে পারেনি কয়েকদিন। বাবার ছুটি ছিল। এক মুহূর্ত নড়েনি বাড়ি থেকে। দুপুরে খেয়ে দেয়ে মোটা একটা ইংরিজি বই বুকের ওপর খুলে রেখে ঘুমিয়েছে ইজিচেয়ারে। কী জানি কেন পড়তে বসলে ওরও ঘুম পায় খুব।

সেদিন সকালে দিদি ইস্কুলে চলে যাবার পরই এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পিকলু নিজেই গিয়ে বসল টুলটার ওপরে। জানালার বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। একটা বিরাট লোহার খাঁচা দাঁড়িয়ে আছে মাঠটার বুকে। ঠিক যেন স্যাম্পল বইয়ে দেখা একটা কঙ্কাল।

মাঠটা মরে ভূত হয়ে গেছে এবার। এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওই কঙ্কালটা।

দিদি বলেছে বাড়িটা নাকি খুব তাড়াতাড়ি উঠে যাবে। রাত জেগে জেগে কাজ করছে মিস্ত্রিরা।

পিকলু মনে মনে ঠিক করে ফেলল আজ রাতে ঘুমোবে না ও। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে আস্তে চুপি চুপি বিছানা থেকে নেমে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবে। দেখবে, কী ভাবে কাজ করে তারা। হাড়গুলোতে একটু একটু করে মাংস লাগায়।

অনেক রাত অবধি জেগেছিল পিকলু। অন্ধকার ঘরে চোখ খুলতে ভরসা পাচ্ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য। মজার ব্যাপারটা ঘটল তখনই। বাড়িটা নিজেই কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। ধবধবে সাদা শরীর নিয়ে হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে।

পিকলুকে অবাক হয়ে যেতে দেখে সে বলল, "কী, হাঁ করে দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে? কেমন সেজেছি বল তো?"

পিকলু বলল, "বাঃ কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। খুব ভাল লাগছে আমার।"

"লাগবেই তো। আমি যে তোমার বন্ধু।"

একথা শুনে একটু যেন অহংকারই হল পিকলুর। বন্ধু বলে ওকে যখন খাতিরই করছে এতটা, তখন আর ছাতে উঠতে ভয়টা কিসের! আর, একবার সেখানে উঠতে পারলে আকাশের শেষ সীমানা পর্যন্ত ও দেখে নেবে ভাল করে।

কিন্তু কবে যে সারবে পা-টা! মাঠটার ওপর আবার রাগ হল খুব। কেন যে এমন ক্ষতি করল ওর। কী দোষ করেছিল ও।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই যেই উঠে বসতে গেছে ও বিছানার ওপর, মা ছুটে এল তাড়াতাড়ি। "না না, উঠবে না তুমি একদম। শোনো। আমি দুধ গরম করে নিয়ে আসছি।"

বাবাও এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। গম্ভীরমুখে বলল, "ঠাণ্ডা লাগিয়ে বাধিয়েছ তো এই জ্বরটা বাধিয়েছে। একদম নড়বে না তুমি বিছানা থেকে।"

ঠাণ্ডা হাওয়ার ভয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল বাবা। কী বিশ্রী শব্দ করে শব্দ হল একটা। যেন মাঠটাই মুখ ভেঙচে হেসে উঠল বিকট শব্দ করে।

পিকলুর মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। মাঠটাই এর জন্যে দায়ী। হয়ত জ্বরটাকে সেই পাঠিয়েছে। মরেও শান্তি দেবে না সে ওকে। কিন্তু বন্ধু কী ভাববে এখন ওর সম্বন্ধে? হয়ত বলবে, "ভিতু কোথাকার!"

আট-দশদিন জ্বরে ভুগল পিকলু। এই কদিন একবারও জানালাটা খোলা হয়নি। বাবাই খুলতে দেয়নি। ঘরে ঢুকে আগে দেখেছে, ওটা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা। তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জামার বোতাম খুলেছে।

তবু একদিন কী করে যেন জানালা গলিয়ে বাড়িটা ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতরে। ওর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। "কী ঘুমোচ্ছ কেন? ওঠ, উঠে পড়। ছাতে চড়বে না?"

"সত্যি?" আনন্দটা আর চেপে রাখতে পারেনি ও।

"হ্যাঁ" অনেক উঁচু ছাতে চড়াব তোমাকে। দেরি কোরো না। জলদি চল।"

অনেক, অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল পিকলু। চাঁদিয়াল ঘুড়িটা সেদিন যেখানে উঠেছিল ঠিক সেখানে। খুব মজা লাগছিল ওর। ওদের বাড়িটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। মা জানবে না বাবা টের পাবে না। সারা আকাশ ঘুরে বেড়িয়ে ঠিক করে কখন ঢুকে পড়বে ও বিছানার ভিতরে।

মাঠটা দেখুক। দেখে দেখে হিংসেয় জ্বলে মরুক। কেমন জব্দ এবার!

হঠাৎ কী হল। শুনতে পেল ও মা বাবাকে বলছে, "ঘাম হচ্ছে খুব খোকার। জ্বরটা বোধহয় ছেড়ে যাবে।"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সারা ঘরে ও খুঁজছিল বাড়িটাকে। কোন ফাঁকে সরে পড়েছে কে জানে।

কতদিন বাদে পিকলু আজ উঠে বসেছে বিছানার ওপর। জানালাটা কে খুলে দিয়েছে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে একবার বসে জানালাটার পাশে। চাঁদিয়াল ঘুড়িটা সেদিন যেখানে উঠে গিয়ে আটকে ছিল, আকাশের সেই জায়গাটা খুঁজে দেখে।

ঘরে কেউ ছিল না। একটা পেনসিল নিতে ঘরে ঢুকেছিল রানু। ও ডাকল তাকে, "এই দিদি শোন্।"

"কী?" কাছে এগিয়ে এল রানু।

"বাড়িটা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত উঁচু হয়েছে রে?"

"খু—ব উঁচু। সাদা রং করেছে।"

"করবেই তো।" যেন পিকলুর সব জানা। ওর সঙ্গে পরামর্শ করেই সব কিছু করা হচ্ছে।

মনে মনে একবার কী ভাবল পিকলু। তারপর বলল, "আজের বাড়িটা তুই নিবি দিদি? ওটা আমার আর চাই না।"

রানু বুঝতে পারল পিকলুর মনের কথাটা। কাছে সরে এসে বলল, "জানালার ধারে বসবি? বাবা বকবে না তোকে।"

হাত ধরতে হল না। পিকলু নিজেই ওর পা-টাকে টেনে টেনে হাজির হল জানালাটার সামনে।

কিন্তু এ কী! আকাশটা গেল কোথায়? বাড়িটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে কটমট করে। বিরাট একটা রাক্ষসের মতো।

তবে কি মাঠটাকেই শুধু মেরে ফেলেনি রাক্ষসটা, আকাশটাকেও গিলে খেয়েছে? আর কোনদিন ও খুঁজে পাবে না তাকে।

দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল এবার পিকলুর।

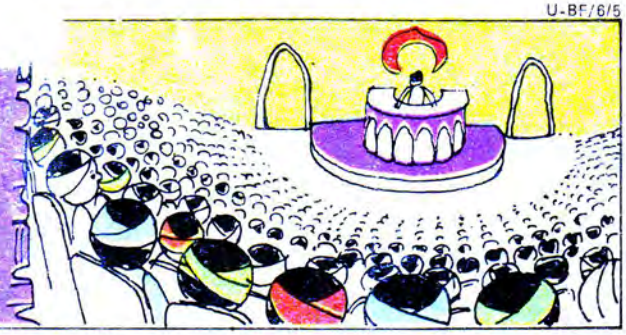

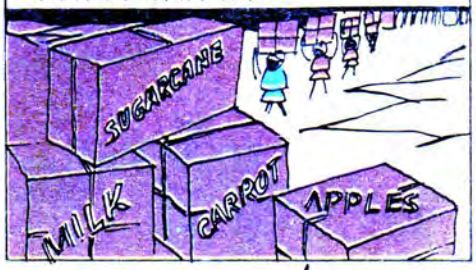

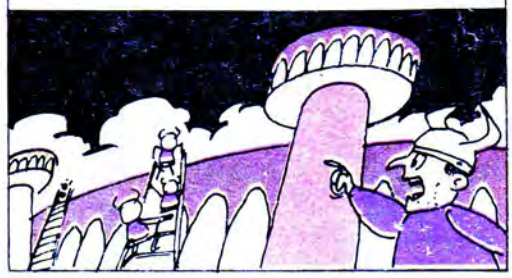

U-BF/6/5
মুখমণ্ডলের সুরক্ষার সংকল্প
কয়েক মাস ধরে দন্ত-ভক্ষক অম্ল (COOH*) মুখমণ্ডল আক্রমণ করার হুমকি দিচ্ছিলো। মুখমণ্ডল দেশের রাষ্ট্রীয় বিধান সভায় যুদ্ধের সামগ্রী বিদেশ থেকে নিয়ে আসার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো।
অল্প দিনের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্রে ভর্তি এক জাহাজ এসে ভিড়লো।
সৈন্যরা তাড়াতাড়ি দাঁতের কেল্লাকে মজবুত বানাতে লেগে গেলো···তার পর শুরু হলো পরীক্ষা ক'রে দেখার কাজ।
SUGARCANE
MILK
CARROT
APPLES
একদিন রাতে যখন সকলেই ঘুমিয়ে ছিলো তখন দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদল হঠাৎ ঢুকে হামলা করলো।
মুখমণ্ডলের বাসিন্দারা প্রাণপণে লড়াই করতে লাগলো। কিন্তু তারা দন্ত-ভক্ষককে রুখতে পারলো না, কারণ সে আচমকা হামলা করার সুবিধা পেয়েছিলো।
একমাত্র আশা!
বিনাকা এফ-কে ডেকে পাঠাও!
তারপর···বিনাকা এফ তার অমোঘ অস্ত্র বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট সঙ্গে নিয়ে ধেয়ে এলো!
Binaca
দন্ত-ভক্ষক একবার এর মোকাবিলা করোতো দেখি।
পিছু হটো, পালাও···পালাও
বিনাকা এফ আর মুখমণ্ডলের সৈন্যরা মিলিত হয়ে দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদের কচু-কাটা করলো।
ধন্য, ধন্য!
আমরা প্রাণে বাঁচলাম!
পুরণো অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট নয়। দাঁতের কেল্লাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে দিনে দু'বার বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে ব্রাশ করা একান্ত দরকার।
বিনাকা-এফ জিন্দাবাদ!
Binaca Fluoride
Binaca Fluoride
* দাঁতের এনামেল নষ্ট ক'রে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত সৃষ্টিকারী কার্বোক্সিল অ্যাসিড গ্রুপের ফর্মুলা।
বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্ত-ক্ষয় বন্ধ করার জন্যে — বিনাকা ফ্লোরাইড।